USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

WINROCK INTERNATIONAL

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

বন, জলাভূমি ও মৎস্যসম্পদ, পরিবেশ এবং জলবায়ু বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালাসমূহ

(স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর সদস্যদের জন্য)

Training Manual

Forests, Wetlands & Fisheries, Environment and Climate related Laws, Rules and Policies

(For Local Government Officers and CMOs Members)

ডিসেম্বর, ২০১৪

ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলিহুডস্ (ক্রেল) প্রকল্প

বন অধিদপ্তর

Department of Environment

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

বন, জলাভূমি ও মৎস্যসম্পদ, পরিবেশ এবং জলবায়ু বিষয়ক আইন, বিধি এবং নীতিমালাসমূহ

(স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের জন্য)

প্রকাশক	ঃ	ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলিহুডস্ (ক্রেল) প্রকল্প
সরকারী পার্টনার	ঃ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তর
সংকলন ও প্রণয়ন	ঃ	এম.এ. ওয়াহাব মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম
সম্পাদনা	ঃ	এ.কে.এম. শামসুদ্দীন ডঃ গোলাম মোস্তফা উৎপল দত্ত
কারিগরি পরামর্শ	ঃ	গোলাম রাব্বানি ডঃ দ্বিজেন মল্লিক
প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন	ঃ	মোঃ জব্বার হোসেন
প্রকাশনাকাল	ঃ	ডিসেম্বর, ২০১৪
কপি রাইট	ঃ	ক্রেল প্রকল্প
অর্থায়ন	ঃ	ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি)

এই প্রকাশনাটি আমেরিকার জনগনের পক্ষে ইউএসএআইডি-র আর্থিক সহায়তায় করা। এতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই উইনরক ইন্টারন্যাশনালের। এর সাথে আমেরিকার সরকার বা ইউএসএআইডি-র মতের মিল নাও থাকতে পারে।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের অবদান অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। এ দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ২০১২ সাল থেকে ইউএসএআইডি এর আর্থিক সহায়তায় বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলিহুডস্ (ক্রেল) প্রকল্প কাজ করছে।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে আরও ভালো এবং সুষ্ঠ ব্যবহারের লক্ষ্যে ক্রেল প্রকল্প প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদেরকে প্রাকৃতিক সম্পদের আইন, বিধি ও নীতিমালা বিষয়ে অধিকতর সচেতন ও সম্পৃক্ত করার নিমিত্তে "বন, জলাভূমি ও মৎস্যসম্পদ, পরিবেশ এবং জলবায়ু বিষয়ক আইন, বিধি এবং নীতিমালাসমূহ" এর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি তৈরী করা হয়েছে। জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যব্যস্থাপনার লক্ষ্যে এই ম্যানুয়ালটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

এ ম্যানুয়ালটি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোকে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও রক্ষায় আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য তৈরী করা হয়েছে। ম্যানুয়ালটিতে বন, জলাভূমি, মৎস্যসম্পদ, পরিবেশ এবং জলবায়ু বিষয়ক আইন, বিধি এবং নীতিমালাসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ম্যানুয়ালটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটিতে কিছু ছবি ও প্রশিক্ষণে উপস্থাপিত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হয়েছে যেখানে খুব সহজ, সাধারণ এবং বিস্তারিতভাবে প্রশিক্ষণের বিষয়, উদ্দেশ্য, উপকরণ ও প্রক্রিয়াসমূহ ব্যবহার হয়েছে যাতে একজন প্রশিক্ষক সহজে বুঝে উঠতে পারেন এবং স্বাচ্ছন্দ্যতার সাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে পারেন। সর্বোপরি এর মাধ্যমে একটি সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এ ম্যানুয়ালে আইন ও বিধি, বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা, বাংলাদেশে বর্তমান জলাভূমি ও মৎস্য বিষয়ক আইনসমূহ, পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনার আইন ও নীতিসমূহ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইন ও নীতিসমূহের উপর মোট ৫টি মডিউল সংযুক্ত করা হয়েছে। যাতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যগণ তাঁদের দক্ষতা অর্জন করে মাঠ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাগণের সহায়তায় সহ-ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আইন ও বিধিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারেন।

ম্যানুয়ালে বর্ণিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং উপকরণসমূহ পরামর্শমূলক তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকগণ তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণকে সমৃদ্ধি সাধন করবেন যা প্রশিক্ষণকে উন্নতর এবং শিখনের পরিবেশ তৈরীতে সহায়তা করবে।

এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ব্যবহার করে যদি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যগণ সরকারের সাথে যৌথভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত আইন ও বিধিসমূহ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সহায়তা পান তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। মূলতঃ এ ম্যানুয়ালটি প্রণয়নে ক্রেল প্রকল্পের "আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিচারিক ব্যবস্থাঃ পরিবেশ, প্রতিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক" প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের সহায়তা নেওয়া হয়েছে এবং এর সমৃদ্ধি সাধনে যাঁরা সহযোগিতা করছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

জন এ ডর, পিএইচডি
ডেপুটি চিফ অফ পার্টি
ক্রেল প্রকল্প

“বন, জলাভূমি ও মৎস্যসম্পদ, পরিবেশ এবং জলবায়ু বিষয়ক আইন, বিধি এবং নীতিমালাসমূহ” এর প্রশিক্ষণ

(Training on Forests, Wetlands & Fisheries, Environment and Climate related Laws, Rules and Policies)

(স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর সদস্যদের জন্য)

প্রশিক্ষণ অধিবেশন সূচী

প্রশিক্ষণের স্থান ঃ -----------------------------------

তারিখ ঃ ---

সময়	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
০৮ঃ৪৫-০৯ঃ০০	নিবন্ধন	নিবন্ধন ফরম	ফেসিলিটেটর
০৯ঃ০০-০৯ঃ৩০	প্রারম্ভিক অধিবেশনঃ স্বাগত বক্তব্য, উদ্বোধন ও সূচনা এবং প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি ও পরিচিতি। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য। অংশগ্রহণকারীদে প্রত্যাশা যাচাই	আলোচনা, দ্বৈত/একক পরিচয়, ভিপ কার্ড, পোষ্টার প্রদর্শন	ফেসিলিটেটর
০৯ঃ০০-০৯ঃ৪৫	অধিবেশন-১ঃ আইন ও বিধি	আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন (পিপিপি)/ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
০৯ঃ৪৫-১০ঃ৪৫	অধিবেশন-২ঃ বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা	আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন (পিপিপি)/ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১০ঃ৪৫-১১ঃ১৫	স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান	অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ	ফেসিলিটেটর
১১ঃ১৫-১২ঃ১৫	অধিবেশন-৩ঃ বাংলাদেশে বর্তমান জলাভূমি ও মৎস্য বিষয়ক আইনসমূহ	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১২ঃ১৫-১৩ঃ১৫	অধিবেশন-৪ঃ পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনার আইন ও নীতিসমূহ	আলোচনা, পিপিপি/ ফ্লিপ চার্ট, ছোট দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা, প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১৩ঃ১৫-১৪ঃ১৫	স্বাস্থ্য বিরতি, নামাজ ও দুপুরের খাবার	অংশগ্রহণকারীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা	ফেসিলিটেটর
১৪ঃ১৫-১৫ঃ১৫	অধিবেশন-৫ঃ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইন ও নীতিসমূহ	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	ফেসিলিটেটর
১৫ঃ১৫-১৫ঃ৩০	স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান	অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ	ফেসিলিটেটর
১৫ঃ৩০-১৬ঃ১৫	সমাপনি অধিবেশনঃ প্রশিক্ষণ পরবর্তী শিখন যাচাই, প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও প্রত্যাশা পর্যালোচনা এবং প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান ও সমাপ্তি ঘোষনা	শিখন যাচাই ফরমেট, মূল্যায়ন ফরমেট, অংশগ্রহণমূলখ আলোচনা	ফেসিলিটেটর

সূচিপত্র

মডিউল ১

আইন ও বিধি

- আইন, বিধি এবং নীতিমালা
- বন আইন, বন্যপ্রাণী আইন, জলাভূমি আইন এবং মৎস্য আইন
- আইন প্রয়োগ ও ব্যবহারে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের সুবিধা
- প্রাকৃতিক সম্পদ আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের ভূমিকা

পৃষ্ঠা ০১

মডিউল ২

বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা

- আইনের দৃষ্টিকোন হতে বনের শ্রেণীবিভাগ
- বন আইন, ১৯২৭
- সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধনী, ২০১০)
- বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১১
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২
- বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০
- বন নীতি, ১৯৯৪

পৃষ্ঠা ১০

মডিউল ৩

বাংলাদেশে বর্তমান জলাভূমি ও মৎস্য বিষয়ক আইনসমূহ

- জলাভূমি সংরক্ষণ
- বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩
- সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯
- মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০
- মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৮৫
- মেরিন ফিশারিজ অর্ডিনেন্স, ১৯৮৩
- মৎস্য নীতি-১৯৯৮

পৃষ্ঠা ৩৭

মডিউল ৪

পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনার আইন ও নীতিসমূহ

- পরিবেশ নীতি, ১৯৯২
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০)
- ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩
- করাতকল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২
- উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫

পৃষ্ঠা ৪৮

মডিউল ৫

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইন ও নীতিসমূহ

- ন্যাশনাল এডাপটেশন প্রোগ্রাম অব একশন (নাপা), ২০০৫
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২

পৃষ্ঠা ৬৩

মডিউল ১

আইন ও বিধি

মডিউল ১
আইন ও বিধি

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয় জানতে ও বুঝতে পারবেন-

- আইন, বিধি ও নীতিমালা কি এবং এর ব্যাখ্যা;
- বন এবং বন্যপ্রাণী আইন এর বর্ণনা;
- জলাভূমি এবং মৎস্য আইন এর পরিচিতি;
- আইন প্রয়োগ ও ব্যবহারে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের সুবিধাসমূহ বর্ণনা; এবং
- প্রাকৃতিক সম্পদ আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের ভূমিকা।

সময় ঃ ৪৫ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ মুক্ত আলোচনা, ঝোড়ো ভাবনা, কার্ড লিখন, দলীয় কাজ, আলোচনা এবং পোস্টার প্রদর্শন/দৃশ্যমান উপস্থাপনা।

উপকরণ ঃ হ্যান্ড আউট, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার, ভিপ কার্ড, পোস্টার এবং মাল্টিমিডিয়া।

প্রক্রিয়া ঃ

ধাপ-০১ # অধিবেশনে স্বাগত ও শুভেচ্ছা

- অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কুশল বিনিময় করুন এবং আলোচনা শুরু করুন ।
- বলুন, এখন আমরা আইন, বিধি ও নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করবো।

ধাপ-০২ # আইন, বিধি ও নীতিমালা

- বলুন, আমরা সবাই 'আইন' শব্দের সাথে পরিচিত। প্রকতপক্ষে আইন বলতে কি বুঝি?
- এবার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, বিধি কি? তাঁদের উত্তরগুলো শুনুন এবং প্রয়োজনে ফ্লিপ চার্টে বা বোর্ডে লিখুন। একইভাবে তাঁদের কাছে জানতে চান, নীতিমালা কি? তাঁদের উত্তরগুলো শুনার পর নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করে ধারণা পরিষ্কার করুন।
- প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের সাথে এ বিষয়ে হ্যান্ড আউট এর সহায়তায় কিংবা পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

ধাপ-০৩ # বন, বন্যপ্রাণী, জলাভূমি এবং মৎস্য আইন

- এ পর্যায়ে বলুন, বন ও বন্যপ্রাণী আইন বলতে কি বুঝি?
- এবার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, জলাভূমি ও মৎস্য আইন বলতে কি বুঝায়? তাঁদের উত্তরগুলো শোনার পর হ্যান্ড আউট এর সহায়তায় তৈরিকৃত পোস্টার প্রদর্শন করে অথবা মাল্টিমিডিয়াতে ধারাবাহিকভাবে বিষয়গুলো দেখিয়ে এবং আলোচনা করে ধারণা পরিষ্কার করুন।

ধাপ-০৪ # আইন প্রয়োগ ও ব্যবহারে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের সুবিধা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের ভূমিকা

- এ পর্যায়ে বলুন, বন ও বন্যপ্রাণী আইন বলতে কি বুঝি?
- এবার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, জলাভূমি ও মৎস্য আইন বলতে কি বুঝায়? তাঁদের উত্তরগুলো শোনার পর হ্যান্ড আউট এর সহায়তায় তৈরিকৃত পোস্টার প্রদর্শন করে অথবা মাল্টিমিডিয়াতে ধারাবাহিকভাবে বিষয়গুলো দেখিয়ে এবং আলোচনা করে ধারণা পরিষ্কার করুন।

অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চান প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য বন, বন্যপ্রাণী এবং মৎস্য আইন বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?

এবার দলীয় কাজের জন্য অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করুন এবং প্রতিটি দলকে ২টি বিষয় যথা- আইন প্রয়োগ ও ব্যবহারে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের সুবিধাসমূহ কি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের ভূমিকাগুলো কি বিষয়গুলো বন্টন করে দিন। দলিয় কাজের জন্য নিম্নের ছকটি ব্যবহার করুন-

দলীয় কাজের ছকঃ আইন প্রয়োগের সুবিধা ও বাস্তবায়নে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের ভূমিকা

ক্রমিক	আইন, বিধির ক্ষেত্রসমূহ	আইন, বিধি ও নীত প্রয়োগের সুবিধাসসমূহ	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের উক্ত আইন বাস্তবায়নে ভূমিকা
১	বন		
২	বন্যপ্রাণী		
৩	মৎস্য		
৪	পরিবেশ		
৫	জলবায়ু		

- তিটি দলকে তাঁদের পাওয়া বিষয়ের উপর আলোচনা করে পোস্টারে লিখতে বলুন। দলীয় কাজের জন্য সময় দিন ১৫ মিনিট।
- নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রতিটি দলকে তাঁদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- দলীয় কাজের উপস্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য বাদ পড়লে তা হ্যান্ড আউট এর সহায়তা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করুন।
- সবশেষে ছোট ছোট প্রশ্ন করে অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।
- ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

হ্যান্ড আউট-১

আইন ও বিধি

আইন (Law)

সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে 'আইন' অর্থ কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশের আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন প্রথা বা রীতিকে বোঝায়। সহজ ভাষায় আইন/Law বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কিছু নিয়মের সমষ্টি বোঝায় যার মূল লক্ষ্য হল রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং নাগরিকদের মাঝে শান্তি শৃংঙ্খলা বজায় রাখা । এই আইন যখন পার্লামেন্টে পাশ হয় তখন তাকে বলা হয় Act.

বিধি (Rules)

The General Clauses Act, 1897 এর ধারা ৩(৪৭) অনুসারে 'বিধি' অর্থ কোন আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত কোন বিধিকে বুঝায় এবং আইনের অধীন বিধি হিসেবে প্রণীত কোন প্রবিধিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ যা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ধারা ২০ এর ক্ষতাবলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত। সাধারণত মূল আইন এর বিধানগুলোকে আরও বিস্তারিত দিকনির্দেশনাসহ বিধিমালা রচিত হয়। যেমন পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ধারা ১২ পরিবেশগত ছাড়পত্র নেওয়ার নির্দেশ দিলেও কিভাবে পরিবেশগত ছাড়পত্র উত্তোলন করতে হবে তার পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর বিধি ৭ এ পাওয়া যায়।

নীতিমালা

সরকারি ও বেসরকারি সকল পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম ও কর্মসূচি সঠিক ভাবে প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে তাদের করণীয় সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে দিকনির্দেশনা সম্বলিত যে রূপরেখা প্রণয়ন করা হয় তাকে নীতিমালা বলে। যেমনঃ পরিবেশ নীতিমালা, ১৯৯২। যেহেতু নীতিমালা কেবল দিকনির্দেশনাই প্রণয়ন করে তাই ইহা বাস্তবায়ন বা অনুসরণ করা কাম্য হলেও আইনের মত বাধ্যতামূলক নয়। আইন সংসদ দ্বারা প্রণীত হলেও নীতিমালা নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক প্রণীত দিকনির্দেশনা।

বন আইন

বন আইন বলতে চিহ্নিত বনভূমির কার্যক্রমগুলোর পরিচালনাকে বুঝায়, বিশেষ করে বন ব্যবস্থাপনা বিষয়কে প্রাধান্য দেয়। বন ব্যবস্থাপনার আইনসমূহ ব্যবস্থাপনার নীতিগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে, যেমন বনের বহুবিধ ব্যবহার ও টেকসই উৎপাদন, যার মাধ্যমে সরকারী বনজ সম্পদগুলোর ব্যবস্থাপনা হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত সরকারী বন ভূমিগুলিতে বন আইনসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকে, এবং বন জরিপ, পরিকল্পনা ও সংরক্ষণেও জড়িত থাকে। এর বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে বন উজাড় রোধ করা বা নিয়ন্ত্রণ করা।

বন্যপ্রাণী আইন

জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য বন্যপ্রাণী আইন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রায় সকল ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ প্রয়োজন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বন্যপ্রাণী আইনের মাধ্যমে প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা, বিপদাপন্ন প্রজাতি রক্ষা, পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী হ্রাস পেলে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা, আগ্রাসী (Invasive) বন্যপ্রাণীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, এবং আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রমে সাহায্য করতে পারে।

জলাভূমি আইন

জলাভূমি আইন হচ্ছে সরকারের নির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহের সর্তক পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ যা জলাভূমিসমূহে প্রভাব ফেলে। এতে সাধারণত যুক্ত থাকে কোন কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে সরকারের একটি সংস্থার দ্বারা পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের বিষয়। এতে অন্তর্ভূক্ত থাকে আইন, বিধি এবং প্রবিধি, এছাড়া নির্বাহী আদেশসমূহ যা জলাভূমির ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

মৎস্য আইন

মৎস্যসম্পদের আইন আইনের একটি বিকশিত (Emerging) এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্র। মৎস্যসম্পদের আইন হচ্ছে বিভিন্ন মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলোর শিক্ষা ও বিশ্লেষণ। মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব, এ সম্পদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা, প্রাপ্যতা এবং যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার মৎস্যবিষয়ক কতিপয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে।

আইন প্রয়োগ ও ব্যবহারে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের সুবিধাসমূহ

বন ও বন্যপ্রাণী আইন প্রয়োগের সুবিধাসমূহ

- বন সংরক্ষণ, রক্ষা বা বৃদ্ধি করতে পারবেন
- বন রক্ষার আইন সম্পর্কে অবহিত হবেন
- বনের সুষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হয়
- বন নীতি বাস্তবায়নের জন্য আইনের দরকার
- বন বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা সম্পর্কে জেনে জনগণকে সচেতন করা সহজতর হয়
- বনের উপর নির্ভরশীল জনগণ তাদের অধিকার জানতে পারবেন
- কি করা যাবে কি করা যাবেনা এ সম্পর্কে সতর্ক হবেন
- বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও সংরক্ষণ করা সহজতর হয়
- সামাজিক বনায়ন বৃদ্ধি পাবে
- সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর হয়

আইন প্রয়োগ ও ব্যবহারে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের সুবিধাসমূহ

জলাভূমি ও মৎস্য আইন প্রয়োগের সুবিধাসমূহ

- জলাভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা করে
- জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত হবে
- প্রকৃত মৎস্যজীবীদের দ্বারা জলমহল ব্যবস্থাপনা হবে
- ইজারাকৃত জলমহাল সাবলিজ দেয়া বন্ধ হবে
- মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ হবে
- অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ বন্ধ হবে
- মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে উঠবে
- ডিমওয়ালা মাছ সংরক্ষণ হবে
- মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে ও জীববৈচিত্র্যের উন্নয় ঘটবে

পরিবেশ আইন প্রয়োগের সুবিধাসমূহ

- পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন হবে
- দূষণ হতে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা পাবে
- পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিত হবে
- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা হবে
- প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিত হবে
- দেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা পাবে
- পাহার কাটা, অবৈধ ইট-ভাটা এবং করাতকল স্থাপন বন্ধ হবে

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রয়োগের সুবিধাসমূহ

- জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্বন নিঃসরণ কমবে
- জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ও প্রশমন কৌশলের বাস্তবায়ন হবে
- জলবায়ু পরিবর্তন রোধে পরিকল্পনা প্রণয়ন হয়
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরিকল্পনা সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়
- দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সহায়তা করা যায়
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পায়
- জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন সম্পর্কে অবহিত হবেন

প্রাকৃতিক সম্পদ আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের ভূমিকা

বন ও বন্যপ্রাণী আইন বাস্তবায়নে ভূমিকা

- সংরক্ষিত বন ও রক্ষিত বনে নিষিদ্ধ কার্যক্রম বন্ধে সরকারকে সহায়তা করা
- বন বিভাগের সহায়তায় বনে অনধিকার প্রবেশে বাধা দেওয়া
- বনে যেন কেউ অগ্নি সংযোগ না করে সে ব্যাপারে সকলকে সতর্ক ও সচেতন করা
- বন হতে কেউ কাঠ অপসারণ করলে বন বিভাগকে খবর দেওয়া
- চাষাবাদ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কেউ বন উজাড় করলে বন বিভাগের সহায়তায় যৌথভাবে বাধা দেওয়া
- কেউ বন্যপ্রাণী শিকার করলে বন বিভাগের সহায়তায় বাধা দেওয়া
- গাছ কাটলে বন বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য জানানো
- ঘাস কাটা বা গোচারণ নিয়ন্ত্রণে সরকারকে সহায়তা করা
- সামাজিক বনায়ন বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করা
- সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা

জলাভূমি ও মৎস্য আইন বাস্তবায়নে ভূমিকা

- জলাধারের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা
- জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণে সরকারকে সহায়তা করা
- জলাধার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সরকারের সাথে যৌথভাবে কাজ করা
- জলমহল ব্যবস্থাপনা যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের দ্বারা হয় সেদিকে খেয়াল রাখা
- কেউ যেন পানিতে বিষ প্রয়োগ বা কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ না করে সেদিকে খেয়াল রাখা
- পানি অপসারণের মাধ্যমে মাছ ধরলে তা বন্ধে উদ্যোগী হওয়া
- কারেন্ট জালের ব্যবহার বন্ধে প্রচারণা চালানো
- জলাশয়ের মৎস্য শিকারে কেউ যাতে স্থায়ী বা অস্থায়ী কোন প্রকার বাঁধ নির্মাণ করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা
- স্থিরকৃত ইঞ্জিন দিয়ে কেউ মাছ ধরলে তা বন্ধে উদ্যোগী হওয়া
- মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়ে কেউ যাতে মাছ না ধরে সে ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করা
- মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠায় গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা
- বিষ প্রয়োগে মাছ ধরা বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা
- ডিমওয়ালা মাছ না ধরতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা

পরিবেশ আইন বাস্তবায়নে ভূমিকা

- পরিবেশ নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করা
- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনায় জনগণকে সচেতন করা
- পাহাড় কাটা বন্ধে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করে সরকারকে সহায়তা করা
- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল কাজ বন্ধে প্রচারণা চালানো
- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ভূমি বা পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হতে পারে এমন কাজ এবং মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দদূষণকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন বন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরকে সহায়তা করা
- ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা
- করাতকল বিধিমালা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করা

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন বাস্তবায়নে ভূমিকা

- জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে অধিক গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ
- দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সচেতনাতা বৃদ্ধি করা
- জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কৌশল প্রণয়নে সহায়তা করা
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরিকল্পনা সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান করা
- দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সহায়তা করা ও কর্মসূচী গ্রহণ
- জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা
- জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে পরামর্শ প্রদান
- সামাজিক বনায়ন সৃষ্টিতে বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ

মডিউল ২

বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা

মডিউল ২
বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- আইনের দৃষ্টিকোন হতে বনের শ্রেণীবিভাগ ও বন আইন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করবেন;
- বন্যপ্রাণী ও সামাজিক বনায়ন আইন ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- বনজদ্রব্য পরিবহন বিধিমালা এবং বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

সময় ঃ ১ ঘন্টা।

পদ্ধতি ঃ মুক্ত আলোচনা, ঝোড়ো ভাবনা, পাঠচক্র, কার্ড লিখন, আলোচনা এবং দৃশ্যমান উপস্থাপনা।

উপকরণ ঃ হ্যান্ড আউট, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার, ভিপ কার্ড, পোস্টার এবং মাল্টিমিডিয়া।

প্রক্রিয়া ঃ

ধাপ-০১ # অধিবেশনে স্বাগত ও শুভেচ্ছা

- অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কুশল বিনিময় করুন।
- পূর্বের অধিবেশনের সূত্র ধরে আলোচনা শুরু করুন।
- বলুন, এখন আমরা বাংলাদেশের বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন ও বিধানসমূহ নিয়ে আলোচনা করবো।

ধাপ-০২ # আইনের দৃষ্টিকোন হতে বনের শ্রেণীবিভাগ ও বন আইন

- বলুন, বাংলাদেশের বন আইন নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা জেনে নেই আইনের দৃষ্টিকোন হতে বনের শ্রেণীবিভাগ কত প্রকার?
- এবার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, বন আইন কি? তাঁদের উত্তরগুলো শুনুন এবং প্রয়োজনে ফ্লিপ চার্টে লিখুন।
- অতঃপর হ্যান্ড আউটের সহায়তা নিয়ে আলোচনা করে ধারণা পরিষ্কার করুন।

ধাপ-০৩ # বন্যপ্রাণী ও সামাজিক বনায়ন আইন

- এপর্যায়ে বলুন, বন্যপ্রাণী আইন কি?
- এবার সামাজিক বনায়ন আইন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য বাদ পড়লে তা হ্যান্ড আউট এর সহায়তা নিয়ে আলোচনা করুন।

ধাপ-০৪ # বনজদ্রব্য পরিবহন বিধিমালা ও করাতকল আইন

- এবার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, বনজদ্রব্য পরিবহন বিধিমালা ও বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ বলতে কি বুঝি? উত্তরগুলো শুনার পর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হ্যান্ড আউটে বর্ণিত বনজদ্রব্য পরিবহন বিধিমালা ও বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ সম্পর্কে তথ্যপত্র সরবরাহ করে বিভিন্ন জনকে অংশবিশেষ পড়ে শুনাতে বলুন এবং তা নিয়ে আলোচনা করুন। অথবা নিজে তা আলোচনা করুন।
- সবশেষে ছোট ছোট প্রশ্ন করে অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।
- ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

হ্যান্ড আউট-২

বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা

আইনের দৃষ্টিকোন হতে বনকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়

(ক) সংরক্ষিত বন (Reserved Forest)

সংরক্ষিত বন বলতে বোঝায় বন আইন, ১৯২৭-এর ২০ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত যে কোন বনভূমি বা পতিত ভূমি। এ ধরনের বনে অনুমতি ব্যতীত সকল ধরনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ।

বন আইন ১৯২৭-এর ২৬ ধারা অনুযায়ী সংরক্ষিত বনে নিম্নলিখিত সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধঃ

- বনে অগ্নিসংযোগ করা;
- অনধিকার প্রবেশ করে গবাদি পশু চরানো;
- বন হতে কাঠ অপসারণ করা;
- বৃক্ষের বাকল তোলা বা বাকল চেঁছে রস সংগ্রহ করা, আইন বহির্ভূতভাবে কাঠ সংগ্রহ করা;
- বৃক্ষ কিংবা কাঠ কাটার সময় অবহেলা বশত বনের ক্ষতি সাধন করা;
- পাথর উত্তোলন, কাঠ কয়লা পোড়ানো বা কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য কাঠ ব্যতীত অন্য কোন বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করা বা সরানো;
- চাষাবাদ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে বন উজাড় করা;
- অনুমোদন ছাড়া শিকার করা, গুলি করা, মাছ ধরা, পানি বিষাক্ত করা, ফাঁদ পাতা।

(খ) রক্ষিত বন (Protected Forest)

রক্ষিত বন বলতে বোঝায় বনজপণ্য রক্ষা, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বন আইন ১৯২৭-এর ২৯ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত যে কোন সরকারী বনভূমি যা রিজার্ভ নয়। এ ধরনের বনে নিষিদ্ধ কার্যক্রম ব্যতীত সকল ধরনের কার্যক্রম করা সম্ভব।

রক্ষিত বনে সরকার বিধি দ্বারা নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেঃ

- গাছ বা কাঠ কাটা, সংগ্রহ ইত্যাদি;
- বনজ দ্রব্য সরানো;
- বন সংলগ্ন শহর বা গ্রামের অধিবাসীদের গাছ, কাঠ বা অন্যান্য বনজদ্রব্য সংগ্রহের স্বার্থে লাইসেন্স প্রদান;
- বাণিজ্যিক স্বার্থে গাছ কাটা বা সরানো বা অন্যান্য বনজদ্রব্য সংগ্রহের লাইসেন্স প্রদান এবং এসকল লাইসেন্স প্রাপ্তদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ;
- বনজদ্রব্য সরানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ;
- ঘাস কাটা বা গোচারণ নিয়ন্ত্রণ;
- চাষাবাদের স্বার্থে বনভূমির ব্যবহার;
- বন ও কাঠ আগুন থেকে রক্ষা করা;
- শিকার করা, মাছ ধরা, পানি বিষাক্ত করা এবং ফাঁদ পাতা।

(গ) অর্পিত বন (Vested Forest)

জমিদারদের মালিকানাধীন বন যা প্রজাস্বত্ব আইনের প্রেক্ষাপটে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে বন বিভাগের নিকট হস্তান্তরিত।

(ঘ) অর্জিত বন (Aquired Forest)

সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত বন।

(ঙ) অশ্রেনীভুক্ত বন (Unclassified Forest)

জেলা প্রশাসনের আওতাধীন বন যা শ্রেনীবিন্যাস করা হয়নি।

এছাড়াও বনকে নিম্ন লিখিতভাবে ভাগ করা যায়

১.রক্ষিত এলাকা

সে সকল বনভূমি যা ১৯২৭ সনের বন আইন এর ১৭ নং ধারা ও ২২ নং ধারা মোতাবেক যথাক্রমে ‘বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য’ ও ‘জাতীয় উদ্যান’ হিসেবে সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে।

২.বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য

এটি এক ধরনের রক্ষিত এলাকা। সে সকল বনভূমি যা ১৯২৭ সনের বন আইন এর ১৭ নং ধারা মোতাবেক মূখ্যতঃ বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বংশ-বিস্তারের লক্ষ্যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যেমনঃ উদ্ভিদ, মাটি ও পানি সংরক্ষণের নিমিত্তে সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে এবং যেখানে বন্যপ্রাণী ধরা, মারা, গুলি ছোড়া বা ফাঁদ পাতা নিষিদ্ধ।

বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা নিষিদ্ধঃ

- প্রবেশ বা স্থায়ীভাবে বসবাস করা;
- চাষাবাদ করা;
- কোন গাছ ধ্বংস করা;
- বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্যের এক মাইলের মধ্যে কোন বন্যপ্রাণী শিকার করা, বধ করা বা ধরা;
- বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্যে কোন বিদেশী বা ভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর প্রবেশ করানো;
- কোন গৃহপালিত পশু প্রবেশ করানো বা ঘুরে বেড়ানোর অনুমোদন দেয়া;
- অগ্নি সংযোগের কোন কারণ ঘটানো; এবং
- বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কোন পানি দূষিত করা।

৩.জাতীয় উদ্যান

এটি এক ধরনের রক্ষিত এলাকা। সে সকল বনভূমি যা ১৯২৭ সনের বন আইন এর ২২ নং ধারা মোতাবেক সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত মনোরম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর এলাকা যার মূখ্য উদ্দেশ্য জনসাধারণকে শিক্ষা, গবেষণা ও বিনোদনের অনুমতি প্রদান এবং উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সুন্দর চিত্রানুগ দৃশ্য সংরক্ষণ করা।

জাতীয় উদ্যানে যেসমস্ত কার্যাদির অনুমোদন দেয়া যাবে না, তা হচ্ছে-

- জাতীয় উদ্যানের মধ্যে এবং এর সীমানার এক মাইলের মধ্যে কোন বন্যপ্রাণী শিকার করা, বধ করা বা ধরা
- বন্দুক ছোঁড়া বা এমন কিছু করা যা বন্যপ্রাণীকে উত্যক্ত করতে পারে;
- এরূপ কিছু করা যা বন্যপ্রাণীর প্রজননের স্থানকে বিঘ্নিত করতে পারে;
- জাতীয় উদ্যানে গাছের কোনভাবে কোন উদ্ভিদ বা গাছের ক্ষতি বা ধ্বংস করা অথবা কোন উদ্ভিদ বা গাছ নেয়া, সংগ্রহ করা বা অপসারণ করা;
- কৃষিকাজের জন্য বা অন্য কোন কারণে কোন জমি পরিষ্কার করা বা চাষাবাদ করা;
- জাতীয় উদ্যানের ভিতরে বা মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কোন জলপ্রবাহকে দূষিত করা।

৪.কোর জোন

"কোর জোন" অর্থ রক্ষিত এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যমান বন এলাকা, যা জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এবং বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বংশবৃদ্ধির জন্য সকল ধরনের বনজদ্রব্য আহরণ সম্পূর্ণ নিষদ্ধ এবং পর্যটক প্রবেশ সীমিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং যা বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ২০ ধারা অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত।

৫.বাফার জোন

"বাফার জোন" অর্থ কোর জোন ব্যতীত রক্ষিত এলাকার প্রান্ত সীমানায় অবস্থিত বনভূমি অথবা লোকালয়ের পার্শ্বে অবক্ষয়িত বন এলাকা, যেখানে স্থানীয় জনসাধারণের বনজদ্রব্য আহরণের প্রবণতা আছে এবং যেখানে রক্ষিত এলাকার উদ্ভিদ প্রজাতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বল্প মেয়াদী অংশীদারিত্ব বনায়নের সুযোগ আছে ও উহার উন্নয়নে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে এবং যা বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ২০ ধারা অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত।

৬.ল্যান্ডস্কেপ জোন বা করিডোর

"ল্যান্ডস্কেপ জোন" অর্থ কোন স্বীকৃত অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান ও ইকোপার্ক এর বাহিরে সরকারি বা বেসরকারি এলাকা, যা রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ও রক্ষিত এলাকার অবক্ষয়রোধে রক্ষিত এলাকার প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যের সহিত মিল রেখে ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং বন্যপ্রাণীর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা হয় এবং যা বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ২০ ধারা অনুসারে ল্যান্ডস্কেপ জোন বা করিডোর হিসাবে ঘোষিত এলাকা।

উপরোক্ত বনগুলো ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এর জন্য আইন, বিধি প্রয়োজন হয়।

➢ উল্লেখযোগ্য বন ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইনগুলো হচ্ছেঃ

- বন আইন, ১৯২৭
- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫
- ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রন) আইন, ১৯৮৯
- করাত কল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৯৮
- সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধনী, ২০১০)
- বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রন) বিধিমালা ২০১১
- বালুমহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২

বন আইন, ১৯২৭

ধারা ১

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও বিস্তৃতি।

- বন আইন ১৯২৭ সমগ্র বাংলাদেশ

ধারা ২

- এ ধারায় গবাদি পশু, বন কর্মকর্তা, বন অপরাধ, বনজদ্রব্য, নদী, কাঠ ও বৃক্ষ এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

ধারা ৩

বন সংরক্ষণের ক্ষমতা

- সরকার যে কোন বনভূমি, পতিত জমিকে সংরক্ষিত বন ঘোষনা করতে পারে।

ধারা ৪

সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন

- বনভূমি সংরক্ষিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ভূমির অবস্থান ও সীমানা নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারী করেন ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা।

ধারা ৫

বন অধিকার অর্জনে বাধা

- কৃষি কাজ বা অন্য উদ্দেশ্যে পরিষ্কার করা যাবে না।

ধারা ৬

ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক ঘোষনা

- ভূমির অবস্থান ও সীমানা নির্ধারণ;
- সংরক্ষিত ঘোষনার ফলাফল ব্যাখ্যা;
- সময় নির্দ্দিষ্ট করে প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনের দাবী দাওয়া গ্রহণ।

ধারা ৭

ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক তদন্ত সরকারী নথিপত্র, সাক্ষ্য গ্রহণ

ধারা ৮

ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের ক্ষমতা

- জরিপ, সীমানা চিহ্নিতকরণ, মানচিত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে প্রবেশের ক্ষমতা;
- দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচারে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা।

ধারা ৯

অধিকার বিলোপ

- ৬ ধারা মোতাবেক দাবী পেশ করা হয়নি এবং ৭ ধারা মোতাবেক তদন্ত হয়নি এরূপ সকল অধিকার লোপ।

ধারা ১০

ঝুম চাষ প্রথা সম্পর্কিত দাবির ব্যবস্থাপনা

- ঝুমচাষ দাবির বিবরন, স্থানীয় আদেশ বা বিধি লিপিবদ্ধ করণ;
- অনুমোদন বা আংশিকভাবে নিষিদ্ধকরণ।

ধারা ১১

দাবিকৃত ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা

- ভূমিতে চলাচলে অধিকার, পশুচারণের অধিকার, বনজদ্রব্যের অধিকার, জল প্রনালীর অধিকার বাতিল বা মঞ্জুর করার আদেশ দিবেন।

ধারা ১২

পশুচারণ বা বনজদ্রব্যের দাবির প্রেক্ষিতে আদেশ

- পশুচারণ বা বনজদ্রব্যের দাবির প্রেক্ষিতে উক্ত দাবি বাতিল বা মঞ্জুর করার আদেশ দিবেন।

ধারা ১৩

ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক নথি লিপিবদ্ধ করণ

- অধিকার দাবিকারীর নাম, পিতার নাম, বর্ণ, বাসস্থান, পেশা, দাবিকৃত সকল মাঠপুঞ্জের নাম ও বিস্তারিত বিবরন।

ধারা ১৪

যে ক্ষেত্রে তিনি দাবী স্বীকার করেন

- দাবী মেনে নেওয়ার বিস্তৃতি, সংখ্যাসহ বিস্তারিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করবেন।

ধারা ১৫

স্বীকৃত অধিকার ব্যবহার

- স্বীকৃত অধিকার অবিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আদেশ জারি করবেন
- প্রস্তাবিত বনাঞ্চলের সীমানা পরিবর্তন করবেন।

ধারা ১৬

অধিকার নিক্রয়ণ

- যে সকল ক্ষেত্রে ১৫ ধারা মোতাবেক বন্দোবস্তের আদেশ প্রদান সম্ভব নয়, যে ক্ষেত্রে অর্থ প্রদান, ভূমি অনুদান প্রদান, বা অন্য কোন প্রকারে উক্ত অধিকার নিক্রয়ণ করবেন।

ধারা ১৬ ক

দাবী নিষ্পত্তির সময়সীমা

- ১২ মাস।

ধারা ১৭

১১, ১২, ১৫, ১৬ ধারার বিরুদ্ধে আপীল

- আদেশ দানের তিন মাসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল পেশ করতে পারবেন।

ধারা ১৮

১৭ ধারা আপীল নিষ্পত্তি

- ৬ মাস এর নিষ্পত্তি করতে পারবেন;
- সরকার সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন।

ধারা ১৯

আইনজীবি

- দাবি পেশকারী কোন আইনজীবি নিয়োগ করতে পারবেন।

ধারা ২০

সংরক্ষিত বন ঘোষণা

ধারা ২১

- **এরূপ প্রজ্ঞাপন বন সংলগ্ন এলাকায় প্রচার**

ধারা ২২

ধারা ১৫ অথবা ধারা ১৮ এর অধীনে গৃহীত ব্যবস্থা পুনরীক্ষণের ক্ষমতা

- সরকার ৫ বছরের ১৫ বা ১৮ ধারায় দেয় আদেশ প্রত্যাহার বা বাতিল করতে পারবেন।

ধারা ২৩

সংরক্ষিত বনে অধিকার অর্জন

- চুক্তি বা ২০ ধারার প্রজ্ঞাপন ব্যাতীত সংরক্ষিত বনে কোন অধিকার অর্জন করা যাবে না।

ধারা ২৪

অনুমোদন ব্যতীত অধিকার হস্তান্তর করা যাবে না

ধারা ২৫

সংরক্ষিত বনে পথ বা পানি প্রবাহ বন্ধ করার ক্ষমতা

- বন কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা পথ বা পানি প্রবাহ বন্ধ করার ক্ষমতা রাখেন তবে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ধারা ২৬

সংরক্ষিত বনে নিষিদ্ধ কার্যক্রম

(১) অগ্নি প্রজ্বলন;
(২) অনধিকার প্রবেশ বা পশু চারন;
(৩) বৃক্ষ বা কাঠ কর্তনের সময় কোন ক্ষতি সাধন;
(৪) পাথর খোঁড়া, কাঠ কয়লা পোড়ানো, কাঠ ছাড়া কোন শিল্পজাত পন্য সংগ্রহ।
এরূপ কর্মের জন্য ৬ মাস কারাদণ্ড এবং ২,০০০/- জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ।

(১ক) যে ব্যক্তি

(ক) নতুন ভাবে বন পরিষ্কার করেন;
(খ) কাঠ অপসারণ করেন;
(গ) অগ্নি সংযোগ করেন;
অথবা যিনি সংরক্ষিত বনে
(ঘ) বৃক্ষ পতিত করেন, রিং আকারে বাকল তোলেন বা অন্য কোন প্রকারে বৃক্ষ এর ক্ষতি সাধন করেন;
(ঙ) চাষাবাদ বা অন্য উদ্দেশ্যে ভূমি পরিস্কার করেন;
(চ) শিকার করা, মাছ ধরা, পানি বিষাক্ত করা বা ফাদ পাতা;
(ছ) কাঠ চিরানোর গর্ত বা করাতের আসন তৈরী বা বৃক্ষকে কাঠে রূপান্তর।
এরূপ কর্মের জন্য সর্বোচ্চ ৫ বছর সর্বনিম্ন ৬ মাস জেল এবং সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ ।

ধারা ২৭

- **ডি রির্জাভ করার ক্ষমতা**

ধারা ২৮

গ্রামীণ বন গঠন

- সংরক্ষিত বনকে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উপর অর্পন করা যায়;
- বন সংরক্ষণ ও উন্নয়নে তাদের কর্তব্য নির্ধারণে বিধি প্রণয়ন।

ধারা ২৮ক

সামাজিক বনায়ন

- সরকারের যে কোন প্রকার ভূমিতে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পারবেন, চুক্তি করতে পারবেন, বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারবেন।

ধারা ২৯

রক্ষিত বন

ধারা ৩০

বৃক্ষ ইত্যাদি সংরক্ষিত করে প্রজ্ঞাপনের ক্ষমতা

ধারা ৩১

সংলগ্ন এলাকায় অনুবাদ প্রকাশ

ধারা ৩২

রক্ষিত বনের জন্য বিধি প্রণয়নের জন্য বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

ধারা ৩৩ (১ক)

যে কোন ব্যাক্তি নিম্নের যে কোন একটি অপরাধ করেন, যথাঃ

(ক) কোন রক্ষিত বনে অগ্নিসংযোগ করেন, অথবা এতদ্বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি লংঘন করে কোন অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, অথবা এরূপ বন বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপে কোন অগ্নি প্রজ্বলিত রেখে যান;

(খ) ৩০ ধারা অনুবলে রক্ষিত কোন বৃক্ষ পাতিত করেন, রিং আকারে বাকল তোলেন, ডালপালা কাটেন, বাকল চেঁচে রস সংগ্রহ করেন, বা কোন বৃক্ষ পোড়ান অথবা বাকল তোলেন অথবা পাতা ছেঁড়েন, অথবা অন্য কোন প্রকারে বৃক্ষের ক্ষতিসাধন করেন;

(গ) ৩০ ধারার নিষেধের বিপরীতে চাষাবাদের জন্য বা অন্য কোন কারণে রক্ষিত বনে ভূমি পরিষ্কার করেন বা ভাঙ্গেন বা কোন ভূমি অন্য কোন প্রকারে চাষাবাদ করেন বা চাষাবাদের উদ্যোগ নেন;

(ঘ) সরকার কর্তৃক এতদ্বিষয়ে প্রণীত বিধি লংঘন করে শিকার করেন, গুলি করেন, ফাঁদ বা ফাঁস পাতেন অথবা কোন বন্যপ্রাণী এবং পাখি, মাছ ধরেন বা বধ করেন অথবা পানি বিষাক্ত করেন;

(ঙ) আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতীত রক্ষিত বনে কাঠ চিড়ানোর গর্ত করেন অথবা করাতের আসন তৈরি করেন অথবা বৃক্ষকে কাঠে রূপান্তর করেন;

(চ) রক্ষিত বন থেকে কোন কাঠ অপসারণ করেন;

তিনি সর্বোচ্চ ৫ বছর সর্বনিম্ন ৬ মাস জেল এবং সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা জরিমান ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।

ধারা ৩৮

প্রাইভেট ফরেষ্ট অর্ডিনেন্স অনুযায় ব্যক্তি মালিকানাধীন বনের উপর নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব অর্পণ করতে পারবে না

ধারা ৩৮খ

পরিবেশ বা ব্যক্তিমালিকানাধিন বা সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিকর কার্যাদি হতে বিরত থাকতে আদেশ জারী

ধারা ৩৮গ

নিষিদ্ধ কার্যাদি

- ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমির ক্ষেত্রে ভূমি ভাঙ্গা, বালাইনাশক ব্যবহার বা অন্যান্য বন ব্যবস্থাপনা কার্যাদি নিষিদ্ধকরণ।

ধারা ৩৮ঘ

বন উৎপাত হ্রাস করণের জন্য ব্যক্তিমালিকানাধীন মালিককে নিকটবর্তি বনের জন্য ক্ষতিকর কার্যাদি বন্ধের আদেশ দিতে পারবেন

ধারা ৩৯

কাঠ ও বনজ দ্রব্যের উপর শুল্ক আরোপের ক্ষমতা-

(ক) যা বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়,

(খ) যা বাংলাদেশের বাহিরের কোন স্থান হতে আনা হয়।

ধারা ৪০

ক্রয়-অর্থ বা রয়েলটিতে সীমাবদ্ধতা প্রযোজ্য না করা

ধারা ৪১

বনজদ্রব্য পরিবহন নিয়ন্ত্রণার্থে বিধি প্রণয়নে ক্ষমতা

- কাঠ বা বনজ দ্রব্যের পরিবহন পথ নিদ্দিষ্টকরণ;
- পাশ প্রদান;
- মার্কিং করা, পরীক্ষা করার ডিপো স্থাপন;
- করাত কল, আসবাবপত্রের বিপনন কেন্দ্র, ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধ করণ;
- মার্কিং পরিবর্তন বা মুছে ফেলা নিষিদ্ধ করা;
- কাঠের মালিকানা চিহ্ন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, নিবন্ধন, সময় নির্ধারণ, নিবন্ধনের জন্য ফিস আরোপ।

ধারা ৪২

৪১ ধারার অধীনে প্রণীত বিধি লংঘনের দণ্ড

- সর্বোচ্চ ৩ বছর সর্বনিম্ন ২মাস জেল এবং সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা সর্বনিম্ন ২,০০০ টাকা জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ।

ধারা ৪৩

ডিপোতে বনজ দ্রব্য ক্ষতি হলে সরকার দায়ী নয়

- ৪১ ধারায় স্থাপিত ডিপোতে বনজ দ্রব্য বিনষ্টের জন্য সরকার দায়ী নন।

ধারা ৪৪

ডিপোতে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি সাহায্য করতে বাধ্য

- সরকারী বা বেসরকারীভাবে নিয়োজিত ব্যক্তি

ধারা ৪৫

কাঠের মালিকানা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী সম্পত্তি রূপে গণ্য হবে

ধারা ৪৬

জলবাহিত ভাসমান কাঠের দাবিদারের প্রতি নোটিশ

- ২ মাসের মধ্যে লিখিত দাবী পেশ।

ধারা ৪৭

জলবাহিত কাঠের দাবির বিষয়ে কার্যক্রম

- তদন্ত করে নিষপত্তি করবেন।

ধারা ৪৮

দাবিদারবিহীন কাঠের ব্যবস্থাপনা

- সরকারের উপর বর্তাবে।

ধারা ৪৯

সরকার এবং তার কর্মকর্তাগণ এরূপ কাঠের ক্ষতির জন্য দায়ী নয়

ধারা ৫০

কাঠ সরবরাহের পূর্বে দাবিদার অর্থ পরিশোধ করবেন

ধারা ৫১

বিধি প্রণয়নের এবং দণ্ড নির্ধারণের ক্ষমতা

- দাবীদারবিহীন কাঠ উদ্ধার, সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনা।

ধারা ৫২

বাজেয়াপ্তযোগ্য সম্পত্তি জব্দকরণ

(১) বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তা বন অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে সকল যন্ত্রপাতি, জলযান, যানবাহন, গবাদিপশু জব্দ করতে পারবেন।

(২) জব্দ করার পর নির্দেশক চিহ্ন (হ্যামার) প্রদান করবেন এবং এখতিয়ারবান ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট প্রতিবেদন (Prosecuting Offence Report-POR) প্রদান করবেন।

অপরাধী অজ্ঞাত হলে উর্ধতন কর্মকর্তাকে একটি প্রতিবেদন (Undetected Offence Report-UDOR) প্রদান করলেই যথেষ্ঠ হবে।

ধারা ৫৩

৫২ ধারা অনুবলে জব্দকৃত সম্পত্তি অবমুক্ত করার ক্ষমতা

- রেঞ্জার পদের নিম্নে নহেন এরূপ কমকর্তা।

ধারা ৫৪

৫২ ধারা অনুবলে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের উপর কার্যক্রম

- ম্যাজিস্ট্রেট হাজিরার সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিচার এবং সম্পত্তি ব্যবস্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ধারা ৫৫

বনজদ্রব্য, যন্ত্রপাতি কখন বাজেয়াপ্তযোগ্য

- যা দিয়ে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এরূপ সকল যান, প্রাণী বাজেয়াপ্তযোগ্য।

ধারা ৫৬

বিচার শেষে বনজদ্রব্যের ব্যবস্থাপন

- একজন বন কর্মকর্তা দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

ধারা ৫৭

অজ্ঞাত বা নিখোজ অপরাধীর ক্ষেত্রে কার্যক্রম

- জব্দকরনের ১ মাস এর মধ্যে কোন দাবী উত্থাপিত না হলে ম্যাজিষ্ট্রেট বন কর্মকর্তা অথবা যে ব্যক্তিকে স্বত্ববান বলে মনে করেন তাকে প্রদান করতে পারেন।

ধারা ৫৮

৫২ ধারা অনুবলে পচনশীল সম্পত্তি সম্পর্কিত কার্যক্রম

- ম্যাজিষ্ট্রেট পচনশীল সম্পত্তি বিক্রয়ের নির্দেশ দিতে পারেন।

ধারা ৫৯

৫৫,৫৬, ৫৭ ধারার বিরুদ্ধ আপীল

- আপীল আদালতে ১ মাসের মধ্যে আপীল করা যাবে।

ধারা ৬০

কখন সম্পত্তি সরকারে বর্তাবে

- ৫৫, ৫৭ ধারা অনুবলে বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ৫৯ ধারা অনুবলে আপীল করা হয়নি এরূপ সম্পত্তি বা আপীল আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারের উপর বর্তাবে।

ধারা ৬১

জব্দকৃত সম্পত্তি অবমুক্ত করার ক্ষমতা সংরক্ষণ

- ৫২ ধারা অনুবলে জব্দকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুক্তিদানের নির্দেশ দিতে পারবেন।

ধারা ৬২

৬২ ঃ অন্যায়ভাবে জব্দকরনের দণ্ড

- সর্বোচ্চ ১ বছর সর্বনিম্ন ১ মাস এবং সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা সর্বনিম্ন ২,০০০ টাকা জরিমানা।

ধারা ৬৩

বৃক্ষ বা কাঠের উপর চিহ্ন জাল বা বিকৃত করার এবং সীমানা চিহ্ন পরিবর্তন করার দণ্ড

- সর্বোচ্চ ৭ বছর সর্বনিম্ন ২ বৎসর এবং সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা সর্বনিম্ন ১০,০০০ টাকা জরিমানা।

ধারা ৬৪

পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেপ্তারের ক্ষমতা

- বন কমকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তার করে অনতিবিলম্বে এখতিয়ারবান ম্যাজিষ্ট্রেট এর নিকট প্রেরণ করবেন।

ধারা ৬৫

গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে মুচলেকায় মুক্তি প্রদানের ক্ষমতা

- সর্বনিম্ন রেঞ্জার ৬৪ ধারায় গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে মুচলেকায় মুক্তি দিতে পারেন।

ধারা ৬৬

অপরাধ সংঘটনে বাধা প্রদান

- বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তা, যে কোন বন অপরাধ সংঘটনে বাধা প্রদান করতে পারবেন।

ধারা ৬৭

অপরাধ সংক্ষিপ্তভাবে বিচারের ক্ষমতা

- ২ বছর মেয়াদ পর্যন্ত দণ্ডনীয় বা অনধিক ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়বিধ দণ্ডনীয় বন অপরাধ ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করতে পারবেন।

ধারা ৬৭ক

ফরেষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ

ধারা ৬৮

অপরাধ আপোষ করার ক্ষমতা

- ২৬(১ক), ৩৩(১ক), ৬২,৬৩ ধারার অপরাধ ব্যতীত ফরেস্ট রেঞ্জার এর নিম্নে নয় এরূপ কর্মকর্তা যাচাই করে মুক্তি দিতে পারবেন।

ধারা ৬৯ — **বনজদ্রব্যের মালিক সরকার বলে অনুমান**

ধারা ৬৯ক — **বন অপরাধের অভিযুক্তি**

- ডেপুটি রেঞ্জার পদের নিম্নে নয় এরূপ কর্মকর্তাকে যে কোন আদালতে বিচারধীন মামলার পক্ষে সরকার পক্ষে পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন।

ধারা ৭০ — **গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশ আইন, ১৮৭১ এর প্রয়োগ**

- গবাদি পশু জব্দ করতে এবং খোঁয়াড়ে দিতে পারেন।

ধারা ৭১ — **ঐ আইনের নির্ধারিত জরিমানা আদায়ের ক্ষমতা**

ধারা ৭২ — **সরকার বন কর্মকর্তাকে কতিপয় ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন**

- জরীপ করা, মানচিত্র তৈরী করা, সাক্ষী হাজির করতে, দলিলাদি, আলামত উপস্থাপন, তল্লাশী পরোয়ানা জারীর ক্ষমতা, বন অপরাধ তদন্ত অনুষ্ঠানের ক্ষমতা।

ধারা ৭৩ — **বন কর্মকর্তাগণ সরকারী কর্মকর্তা বলে বিবেচিত হবেন**

- দণ্ড বিধিতে সরকারী কর্মকর্তা বলতে যা বোঝায়।

ধারা ৭৪ — **সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যাদি সম্পাদন করার জন্য দায় অব্যাহতি**

- মামলা বা বিচার হতে অব্যাহতি।

ধারা ৭৫ — **বন কর্মকর্তাগণ ব্যবসা করতে পারবেন না**

ধারা ৭৬ — **বিধ প্রণয়নের অতিরিক্ত ক্ষমতা**

ধারা ৭৭ — **বিধি ভংগের দণ্ড**

- বিশেষ বিধান নেই অত্র আইনের এরূপ কোন বিধি ভংগ করলে ৬ মাস কারাদণ্ড বা ৫,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৭৮ — **বিধি কখন আইনে বলবৎ হবে**

- গেজেটে প্রকাশের পর।

ধারা ৭৯ — **যে সকল ব্যক্তি বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তাকে সাহায্য করতে বাধ্য**

- অধিকার প্রয়োগকারী অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি, সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রামে নিয়োজিত ব্যক্তি।

ধারা ৮০ — **সরকার ও অন্য ব্যক্তির বন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা**

ধারা ৮১ — **সরকার বনের উৎপন্নে অংশীদারিত্ব ভোগের জন্য কর্ম সম্পাদনে ব্যর্থতা**

ধারা ৮২

- **সরকারী পাওনা আদায়**

ধারা ৮৩

উক্তরূপ অর্থের জন্য বনজদ্রব্যে পূর্ব-স্বত্ব

ধারা ৮৪

এ আইনের আওতায় আবশ্যকীয় ভূমি ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশের অধীনে জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় বলে গণ্য হবে

ধারা ৮৫

মুচলেকার দণ্ড আদায়

সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধনী, ২০১০)

সামাজিক বনায়ন

সরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বন গড়ে তোলা বা বন সৃষ্টি করাকে সামাজিক বনায়ন বলে।

বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন গ্রামীণ জনপদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র-বিমোচনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। সে সাথে সামাজিক বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন উপশম ও অভিযোজনে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

যেভাবে স্থানীয় জনগণ সামাজিক বনায়ন করতে পারবেন

- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন এর (এস.আর ও নং ১০-আইন/২০১০, জানুয়ারী ১৩, ২০১০) বিধি ৩ অনুসারে বনায়নের উপযোগী বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী নিজেদের উদ্যোগে সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্যে বন অধিদপ্তর এর বীট ও রেঞ্জ কার্যালয়ের মাধ্যমে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে পারবেন
- যথার্থতা বিবেচনা করে বন অধিদপ্তর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে বনায়নের অনুমোদন প্রদান করবেন।

সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণের অধিকার যারা পাবেন

- স্থানীয় জনগণ; এবং
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন এর (এস.আর ও নং ১০-আইন/২০১০, জানুয়ারী ১৩, ২০১০) উপবিধি ৪ (স) অনুযায়ী সামাজিক বনায়ন এলাকার ১ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্যে থেকে অংশগ্রহণকারী নির্বাচিত হবেন।

তবে এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ অধিকার পাবেন-

- ভূমিহীন
- ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক
- দুঃস্থ মহিলা
- অনগ্রসর গোষ্ঠী
- দরিদ্র আদিবাসী
- দরিদ্র ফরেষ্ট ভিলেজার
- অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা কিংবা মুক্তিযোদ্ধার অসচ্ছল সন্তান

সামাজিক বনায়নে চুক্তির সমর্থনকারী

- সামজিক বনায়নের জন্য পারস্পারিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে;
- উক্ত চুক্তি সম্পাদনে বন অধিদপ্তর, ভূমির মালিক বা দখলী স্বত্ত্বাধিকারী কোন ব্যক্তি বা সংবিধিবদ্ধ কোন সংস্থা, উপকারভোগী এবং বেসরকারী সংস্থা চুক্তির পক্ষ হতে পারে;
- এই আইনের অধীন সম্পাদিত চুক্তিতে বন অধিদপ্তর ও উপকারভোগী অবশ্যই পক্ষ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে; এবং
- চুক্তিটি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে স্বাক্ষরিত হবে।

সামাজিক বনায়নে চুক্তির মেয়াদ এবং উহা নবায়নের পদ্ধতি

- সামাজিক বনায়নে চুক্তির মেয়াদ বিভিন্নরূপ, যেমন-শাল বনের ক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদ ২০ বৎসর, যা মেয়াদান্তে দুই কিস্তিতে আবর্তকালের মেয়াদ পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হবে;
- প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে ২০ বৎসর, যা মেয়াদান্তে এক কিস্তিতে আবর্তকালের মেয়াদ পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হবে;
- উডলট, কৃষি বনায়ন, স্ট্রীপ প্লান্টেশন, চরাঞ্চল, বরেন্দ্র এলাকা এবং অন্যান্য এলাকায় বৃক্ষ রোপণের ক্ষেত্রে ১০ বৎসর, যা মেয়াদান্তে তিন কিস্তিতে ৩০ বৎসর পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হবে; এবং
- উল্লেখ্য যে, চুক্তিভূক্ত পক্ষগণের পারস্পরিক সম্মতিতে বন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে চুক্তির মেয়াদ নবায়ন করা যাবে।

ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সামাজিক বনায়ন সম্ভব

- ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সমাজিক বনায়ন সম্ভব;
- মালিকানাধীন জমিতে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বন অধিদপ্তরের নিকট আবেদন করতে হবে। আবেদন বিবেচিত হলে বর্ণিত ভূমিতে এই বিধিমালা অনুযায়ী সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে; এবং
- উল্লেখ্য যে, বন অধিদপ্তর ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে বিনিয়োগ করলে আবাদী দ্রব্যাদি পারস্পারিক চুক্তির ভিত্তিতে পক্ষদের মধ্যে বন্টিত হবে।

যেভাবে সামাজিক বনায়ন প্রক্রিয়ায় কমিউনিটি অংশগ্রহণ করতে পারে

- ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা
- দল/নেটওয়ার্ক গঠন
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি
- সহযোগী ব্যবস্থাপনা।

সামাজিক বনায়ন হতে লব্ধ আয়ের বন্টন বা যেভাবে এই সামাজিক সুরক্ষা প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী উপকৃত হতে পারবে

- বিদ্যমান আইনে যুক্তিসঙ্গত কারণে ছাটাইকরা ডাল-পালা, প্রথম ঘনত্ব কমানোর জন্য (Thining/থিনিং) কাটা গাছ, ফল দানকারী গাছের ফল এবং উৎপাদিত কৃষিজাত ফসল সম্পূর্ণভাবে উপকারভোগীগণ প্রাপ্য হবে
- তবে প্রথম ঘনত্ব কমানোর পরবর্তী ঘনত্ব কমানোর সময় এবং আবর্তকাল পূর্ণ হবার পর কাটা গাছ হতে প্রাপ্ত আয় পক্ষগণের মধ্যে নিম্নবর্ণিত হারে বন্টন হবে, যথাঃ-

ক. বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বন ভূমির উডলট ও কৃষিবনের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
বন অধিদপ্তর	৪৫%
উপকারভোগীগণ	৪৫%
বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

খ. শালবন ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
বন অধিদপ্তর	৬৫%
উপকারভোগীগণ	২৫%
বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

গ. বন অধিদপ্তর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি অথবা সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানা বা দখলী স্বত্বাধীন সংকীর্ণ (স্ট্রীপ) ভূমিতে বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
বন অধিদপ্তর	১০%
ভূমির মালিকানা বা দখলীস্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থা	২০%
উপকারভোগীগণ	৫৫%
স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ	৫%
বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

ঘ. চরভূমি ও ফোরশোর বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
বন অধিদপ্তর	২৫%
উপকারভোগীগণ	৪৫%
ভূমির মালিক বা দখলকার	২০%
বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

ঙ. বরেন্দ্র এলাকায় খাড়ি ও পুকুর পাড় পুনর্বাসন ও বনায়নের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
বন অধিদপ্তর	২৫%
উপকারভোগীগণ	৪৫%
ভূমির মালিক বা দখলকার	২০%
বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

চ. শালবন ব্যতীত বিদ্যমান বাগান ও প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
বন অধিদপ্তর	৫০%
উপকারভোগীগণ	৪০%
বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

ছ. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে বন বিভাগের ভূমিতে গৃহীত সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
বন অধিদপ্তর	২৫%
উপকারভোগীগণ	৭৫%

জ. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাষিত সংস্থার ভূমিতে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
বন অধিদপ্তর	১০%
উপকারভোগীগণ	৭৫%
বৃক্ষরোপণ তহবিল	১৫%

উপকারভোগীদের দায়িত্ব ও সুবিধা হস্তান্তর ঃ

- উপকারভোগী ব্যক্তিগণ সম্পাদিত চুক্তির আওতায় তাদের দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা ও সুবিধা তাদের স্ত্রী অথবা স্বামী অথবা অন্য যে কোন উত্তরাধিকারীকে হস্তান্তর করতে পারবে।

বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১১

- উক্ত বিধিমালার ১ উপধারা অনুযায়ী সুন্দরবন, পার্বত্য জেলা রাঙ্গামটি, খাগড়াছড়ি, ও বান্দরবান ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য;
- উক্ত বিধিমালার ৬ উপধারা অনুযায়ী ফ্রি লাইসেন্সের জন্য বিভাগীয় বন কমকর্তার নিকট আবেদন করবেন। ভূমিরমালিকানা সম্পর্কে কোন জটিলতা না থাকলে তদন্ত করে বিনা রাজস্বে ফ্রি লাইসেন্স প্রদান করবেন। প্রতিটি পর্যায়ের কাজের জন্য সময় সুনিদিষ্ট করা হয়েছে;
- তফসিল গ এ বর্ণিত জেলা ও উপজেলা ব্যতীত রেঞ্জ কর্মকর্তা বা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়া গাছ কর্তনের অনুমতি প্রদান করবেন;
- উক্ত বিধিমালার ১০ উপধারা অনুযায়ী আমদানিকৃত বনজদ্রব্যে “আমদানীকৃত” শব্দ খোদাইকৃত হাতুড়ির ছাপ প্রদান করবেন;
- উক্ত বিধিমালার ১১ উপধারা অনুযায়ী মালিকানা হাতুড়ি প্রস্তুত করত উহা নিবন্ধন করতে হবে;
- উক্ত বিধিমালার ১২ উপধারা অনুযায়ী বনজদ্রব্য মজুদ রাখবার জন্য ফি প্রদান করে ডিপো নিবন্ধন করতে হবে;
- উক্ত বিধিমালার ১৩ উপধারা অনুযায়ী ভিনিয়ার ফ্যক্টরী, ফার্নিচার মার্ট বা টিম্বার প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন এর জন্য লাইসেন্স ফি প্রদান করে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে;
- উক্ত বিধি অনুযায়ী ভিনিয়ার ফ্যাক্টরী, ফার্নিচার মার্ট,বা টিম্বার প্রসেসিং ইউনিট গুলো বনজদ্রব্যের আগমন, নির্গমন, চোরাই ও ব্যবহার সংক্রান্ত বিবরণ সংরক্ষণ করতে হবে;
- উক্ত বিধিমালার ১৫ উপধারা অনুযায়ী বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সংবাদদাতা এবং অপরাধ উৎঘাটনকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জব্দকৃত বনজদ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা আদায়কৃত জরিমানা হতে সর্বোচ্চ শতকরা ১০% হারে পুরস্কার প্রদান করতে পারবেন।

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২

এ আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান নিম্নে তুলে ধরা হলো-

ধারা ৬ঃ বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা

- এই আইনের অধীন লাইসেন্স বা ক্ষেত্রমত, পারমিট গ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন বন্যপ্রাণী শিকার বা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোন উদ্ভিদ ইচ্ছাকৃতভাবে উঠানো, উপড়ানো, ধ্বংস বা সংগ্রহ করতে পারবে না;
- সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন নির্দিষ্ট বা সকল বন্যপ্রাণী কোন নির্দিষ্ট বন বা এলাকা বা সমগ্র দেশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিকার নিষিদ্ধ করতে পারবে।

ধারা ৮ঃ বন্যপ্রাণী অপসারণ

কোন বন্যপ্রাণী-
(ক) মানুষের জীবন ও সম্পদের (গৃহপালিত পশু ও ফসলের) প্রতি হুমকির কারণ হলে; অথবা
(খ) দৈহিকভাবে পঙ্গু বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হলে; অথবা
(গ) কোন এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্যের প্রতি হুমকির কারণ হলে-
প্রধান ওয়ার্ডেন বা অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন বা ওয়ার্ডেন কারণ উল্লেখ করে উক্ত বন্যপ্রাণী অপসারণ, হত্যা বা ক্ষেত্রমত, পুনর্বাসনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ধারা ৯ঃ বন্যপ্রাণী অবমুক্তকরণ

ধৃত, উদ্ধারকৃত বা জব্দকৃত কোন বন্যপ্রাণী খাঁচায় বা আবদ্ধ অবস্থায় রাখা উহার জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হলে উক্ত বন্যপ্রাণীকে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ধারা ১০ঃ পারমিট প্রদান

কোন বন্যপ্রাণীর দেহের অংশ, মাংস, ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি সংগ্রহ এবং তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ সংগ্রহ করা, দখলে রাখা, অথবা উহা হতে উৎপাদিত দ্রব্য কোন বন অথবা দেশের যে কোন স্থান হতে পরিবহনের জন্য নিম্নবর্ণিত কারণে প্রধান ওয়ার্ডেন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ফি প্রদান সাপেক্ষে পারমিট প্রদান করতে পারবেন, যথাঃ-

(ক) শিক্ষা;
(খ) বৈজ্ঞানিক গবেষণা;
(গ) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা;
(ঘ) কোন উদ্ভিদ উদ্যান, সাফারী পার্ক, স্বীকৃত চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, হর্বেরিয়াম অথবা একইরূপ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন;
(ঙ) জীবন রক্ষাকারী ঔষধ তৈরির জন্য উদ্ভিদ বা সাপের বিষ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; এবং
(চ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বংশ বিস্তারের জন্য।

ধারা ১৩ঃ অভয়ারণ্য ঘোষণা

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাতীয় বননীতি ও বন মহাপরিকল্পনার আলোকে এবং প্রকৃতি, ভূমিগঠনগত বৈশিষ্ট্য, জীববৈচিত্র্য বা পরিবেশগত গুরুত্ব বিবেচনা করে কোন সাকারি বন, বনের অংশ, সরকারি ভূমি, জলাভূমি বা যে কোন নির্দিষ্ট এলাকাকে বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণের নিমিত্তে সুনির্দিষ্টভাবে সীমানা নির্ধারণপূর্বক, অভয়ারণ্য ঘোষণা করতে পারবে।

ধারা ১৪ঃ অভয়ারণ্য সম্পর্কে বাধা নিষেধ

কোন ব্যক্তি অভয়ারণ্যে-

(ক) চাষাবাদ করতে পারবেন না;
(খ) কোন শিল্প কারখানা স্থাপন বা পরিচালনা করতে পারবেন না;
(গ) কোন উদ্ভিদ আহরণ, ধ্বংস বা সংগ্রহ করতে পারবেন না;
(ঘ) কোন প্রকার অগ্নিসংযোগ করতে পারবেন না;
(ঙ) প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রবেশ করতে পারবেন না;
(চ) কোন বন্যপ্রাণীকে বিরক্ত করতে বা ভয় দেখাতে পারবেন না কিংবা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বিনষ্ট হতে পারে এইরূপ কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য, গোলাবারুদ, বা অন্য কোন অস্ত্র বা দ্রব্য ব্যবহার করতে পারবেন না;
(ছ) বিদেশী (Exotic) প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রবেশ করাতে পারবেন না;
(জ) কোন গৃহপালিত পশু প্রবেশ করাতে বা কোন গৃহপালিত পশুকে নিরুদৃষ্ট রাখতে পারবেন না;
(ঝ) বন্যপ্রাণীর জন্য ক্ষতিকর পদার্থ গাদি (ডাম্পিং) করতে পারবেন না;
(ঞ) কোন খনিজ পদার্থ আহরণের জন্য অনুসন্ধান কিংবা গর্ত করতে পারবেন না;
(ট) উদ্ভিদের প্রাকৃতিক বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে সিলভিকালচারেল অপারেশন ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন উদ্ভিদ বা উহার অংশ কাটতে পারবেন না;
(ঠ) জলপ্রবাহরে গতি পরিবর্তন, বন্ধ বা দূষিত করতে পারবেন না; অথবা
(ড) কোন এলিয়েন (Alien) ও আগ্রাসী (Invasive) প্রাজাতির উদ্ভিদ প্রবেশ করাতে পারবেন না।

এছাড়া কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি এই আইন প্রবর্তনের পর অভয়ারণ্যের সীমানার ২ কিলোমিটারের মধ্যে কোন শিল্প কারখানা বা ইট ভাটা স্থাপন বা পরিচালানা করতে পারবেন না।

ধারা ১৬ঃ অভয়ারণ্য ব্যবস্থাপনা

প্রতিটি অভয়ারণ্যের জন্য সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

ধারা ১৭ঃ জাতীয় উদ্যান ঘোষণা

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন সরকারি বন, বনের অংশ বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত সরকারি ভূমিকে, বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের উন্নয়ন অথবা পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে সীমানা নির্ধারণ পূর্বক, জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে।

ধারা ১৯ঃ সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র ঘোষণা

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যপ্রাণীর স্বীয় আবাসস্থলে (in-situ) বা আবাসস্থলের বাহিরে অন্যত্র (ex-situ) সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অথবা গবেষণা, জনসাধারণের চিত্তবিনোদন বা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যে কোন সরকারি বনভূমিকে, সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান বা ক্ষেত্রমত, বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে।

ধারা ২০ঃ ল্যান্ডস্কেপ জোন বা করিডোর, বাফার জোন ও কোর জোন ঘোষণা

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা স্থানীয় জনসাধারণের মতামত গ্রহণপূর্বক ঘোষিত যে কোন এলাকা, রক্ষিত বা সংরক্ষিত বন এলাকার সীমানার বাহিরে কিন্তু উহার সংলগ্ন যে কোন সরকারি বা বেসরকারি এলাকাকে বন্যপ্রাণী চলাচলের উপযোগী বা বিশেষ উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজনে বা উক্ত এলাকার যে কোন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি কামানো বা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ল্যান্ডস্কেপ জোন বা করিডোর হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে।

ধারা ২১ঃ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সরকার অভয়ারণ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য বন অধিদপ্তর, বনাঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনসাধারণের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করতে পারবে।

ধারা ২২ঃ বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা ঘোষণা

সরকার স্বীয় উদ্যোগে কিংবা কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন সরকারি ভূমি, ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি বা বৃক্ষরাজি অথবা সংরক্ষিত বন, খাস জমি, জলাভূমি, নদী, সমুদ্র, খাল, দীঘি বা বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পুকুরকে উক্ত এলাকার প্রথাগত বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং অনুশাসন সংরক্ষণ সাপেক্ষে বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে।

ধারা ২৩ঃ জাতীয় ঐতিহ্য, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ এবং কুঞ্জবন ঘোষণা

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকারি বন, কোন সংস্থার অধীন ভূমি, খাস জমি বা কমিউনিটির মালিকানাধীন ভূমিতে অবস্থিত বৃক্ষ বা কুঞ্জবন যাহা সাংস্কৃতিক, প্রথাগত, ধর্মীয় বা স্মৃতিস্মারক হিসাবে চিহ্নিত ও ব্যবহৃত এবং যাহা বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল হিসাবে উক্ত এলাকায় পরিচিত তাহা উক্ত ভূমির মালিক, সংস্থা বা ব্যক্তির আবেদনক্রমে, জাতীয় ঐতিহ্য, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ, বা ক্ষেত্রমত, কুঞ্জবন হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে।

ধারা ২৪ঃ লাইসেন্স

কোন ব্যক্তি কোন বন্যপ্রাণী অথবা উহার দেহের অংশ, মাংস, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি বা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোন উদ্ভিদ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চাষ, আহরণ, উৎপাদন, লালন-পালন, আমদানি-রপ্তানি অথবা কোন বন্যপ্রাণী শিকার করতে চাইলে, প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমাতপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট হতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ফি প্রদান সাপেক্ষে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

ধারা ২৫ঃ লাইসেন্স বাতিল ও স্থগিতকরণ

কোন লাইসেন্স গ্রহীতা এই আইন বা বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করলে প্রধান ওয়র্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা লাইসেন্স গ্রহীতাকে যুক্তিসংগত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করে লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করতে পারবেন।

ধারা ২৮ঃ আমদানি

কোন ব্যক্তি-

(ক) আগমন শুল্ক বন্দর ব্যতীত অন্য কোন পথে;

(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সাইটিস (CITES) সার্টিফিকেট ব্যতীত; এবং

(গ) লাইসেন্স ব্যতীত কোন বন্যপ্রাণী বা উহার অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হতে উৎপন্ন দ্রব্য বাংলাদেশে আমদানি করতে পারবেন না।

ধারা ২৯ঃ রপ্তানি

কোন ব্যক্তি-
(ক) বহির্গমন শুল্ক বন্দর ব্যতীত অন্য কোন পথে;
(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সাইটিস (CITES) সার্টিফিকেট ব্যতীত; এবং
(গ) লাইসেন্স ব্যতীত-

কোন বন্যপ্রাণী বা উহার অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হতে উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি বা পুনঃরপ্তানি করতে পারবেন না।

ধারা ৩২ঃ জব্দকরণ

কোন কর্মকর্তা এই আইনের অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত দ্রব্য বা সামগ্রী জব্দ করতে পারবেন, যথাঃ-
(ক) লাইসেন্স ব্যতীত শিকার করা, দখলে রাখা বা ধৃত বন্যপ্রাণী বা উহাদের আবদ্ধ অবস্থায় রাখার কারণে প্রজননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রাণী;
(খ) দুর্ঘটনার কারণে মারা গেছে বা মৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছে এইরূপ বন্যপ্রাণী;
(গ) এই আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত অথবা লাইসেন্স গ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ কোন বন্যপ্রাণী বা উহার কোন অংশ, অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস, দেহের অংশ অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হতে উৎপন্ন দ্রব্য;
(ঘ) অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত অস্ত্র, বস্তু ও যন্ত্রপাতি;
(ঙ) ধারা ২৮ ও ২৯ অনুযায়ী আমদানী বা রপ্তানী করা হয় নাই এমন কোন বন্যপ্রাণী ব উহার অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস, দেহের অংশ অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হতে উৎপন্ন দ্রব্যঃ
তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রথাগত, ঐতিহ্য বা দৈনন্দিন জীবন ধারণের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত বন্যপ্রাণীর ট্রফি বা স্মৃতি চিহ্ন এর ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে না।

ধারা ৩৪ঃ কতিপয় অপরাধের দণ্ড

কোন ব্যক্তি যদি-
(ক) ধারা ১১ এর বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং প্রদত্ত নিবন্ধন চিহ্ন নকল, বিনিময় অথবা অন্য কোনভাবে হস্তক্ষেপ বা পরিবর্তন করেন; বা

(খ) লাইসেন্স অথবা পারমিট প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে কোন বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর কোন অংশ, মাংস, ট্রফি অথবা উহা হতে উৎপন্ন দ্রব্য বা বনজদ্রব্য বা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ অথবা উহা হতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানি-রপ্তানি করেন-

তাহা হলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৩৫ঃ ধারা ১৪ এর বিধান লংঘনের দণ্ড

কোন ব্যক্তি ধারা ১৪ এ উল্লিখিত কোন নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন ও উক্তরূপ অপরাধের জন্য জামিন অযোগ্য হবেন এবং তিনি সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৪ (চার) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৩৬ঃ বাঘ ও হাতি হত্যা, ইত্যাদির দণ্ড

কোন ব্যক্তি ধারা ২৪ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণ না করে তফসিল ১ এ উল্লিখিত কোন বাঘ বা হাতি হত্যা করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন ও উক্তরূপ অপরাধের জন্য জামিন অযোগ্য হবেন এবং তিনি সর্বনিম্ন ২ (দুই) বৎসর এবং সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বৎসর পর্যন্ত করাদণ্ড অথবা সর্বনিম্ন ১ (এক) লক্ষ এবং সর্বোচ্চ ১০ (লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে সর্বোচ্চ ১২ (বার) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৩৭ঃ চিতা বাঘ, লাম চিতা, উল্লুক, সাম্বার হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, তিমি বা ডলফিন হত্যা, ইত্যাদির দণ্ড

কোন ব্যক্তি তফসিল ১ এ উল্লিখিত কোন চিতা বাঘ, লাম চিতা, উল্লুক, সাম্বার, হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, তিমি বা ডলফিন হত্যা করলে তিনি অপরাধ করেছেন বালে গণ্য হবেন এবং উক্তরূপ অপরধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৩৮ঃ পাখি বা পরিযায়ী পাখি হত্যা, ইত্যাদির দণ্ড

কোন ব্যক্তি তফসিল ১ ও ২ এ উল্লিখিত কোন পাখি বা পরিযায়ী পাখি হত্যা করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৩৯ঃ ধারা ৬, ১০, ১১ ও ১২ এর বিধান লংঘনের দণ্ড

কোন ব্যক্তি ধারা ৬, ১০, ১১ ও ১২ এর বিধান লংঘন করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৪০ঃ ধারা ২৪ ও ২৭ এর বিধান লংঘনের দণ্ড

কোন ব্যক্তি ধারা ২৪ ও ২৭ এর বিধান লংঘন করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৪১ঃ অপরাধ সংঘটনের সহায়তা, প্ররোচনা, ইত্যাদির দণ্ড

কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করলে বা উক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা প্রদান করলে এবং উক্ত সহায়তা বা প্ররোচনার ফলে অপরাধটি সংঘটিত হলে, উক্ত সহায়তাকারী বা প্ররোচনাকারী তাহার সহায়তা বা প্ররোচনা দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৪২ঃ মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের বা বেআইনীভাবে জব্দকরণের দণ্ড

এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এই আইনের বিধান লংঘন করে কোন দ্রব্য বা সামগ্রী জব্দ বা কোন ব্যক্তিকে হয়রানি করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্তরূপে অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৪৩ঃ অপরাধের আমলযোগ্যতা, আমল অযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা, জামিন অযোগ্যতা ও আপোষ যোগ্যতা

ধারা ৩৬ এর অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য হবে এবং উক্ত ধারা ব্যতীত অন্যান্য ধারার অধীনে সংঘটিত অপরাধ আমল অ-যোগ্য, জামিনযোগ্য ও ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে আপোষযোগ্য।

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০

এই আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা, সেতু, কালভার্ট, ড্যাম, ব্যারেজ, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, বন, রেললাইন ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা অথবা আবাসিক এলাকা হতে সর্বনিম্ন ১ কিমি এর মধ্যে বালু বা মাটি উত্তোলন নিষিদ্ধ।

বন নীতি, ১৯৯৪

বন নীতি, ১৯৯৪ বিভিন্ন আর্থসামাজিক কারণে দেশের বন সম্পদের অস্বাভাবিক ও দ্রুত অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে পরিবেশের অবনতিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও অনাকাঙ্খিত প্রতিকূলতা মোকাবিলার লক্ষ্যে বন নীতি ১৯৭৯ সংশোধনপূর্বক ইহাকে যুগপোযোগী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে বন নীতি, ১৯৭৯ সংশোধনপূর্বক 'জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়ে ব্যবস্থাদি অবলম্বনের ইচ্ছা করিয়াছেন:

১. বনখাতের উন্নয়নের পূর্বশর্তসমূহ
২. জাতীয় বন নীতির উদ্দেশ্যসমূহ
৩. জাতীয় বন নীতির ঘোষণাসমূহ

বনখাতের উন্নয়নের পূর্বশর্তসমূহ

বনখাতের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পূর্ব শর্তসমূহ হচ্ছে-

- বনখাত হইতে এমন বেশ কিছু পণ্য সামগ্রী ও সেবা পাওয়া যায় যাহা জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অত্যাবশ্যক। বাড়িঘর, নৌকা ইত্যাদি তৈরির জন্য কাঠ, রান্নাবান্নার কাজের জন্য জ্বালানিকাঠ, গবাদি পশুর খাদ্য, স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য ঔষধ জাতীয় লতাপাতা, গুল্ম ও ফলমুল এবং মৃত্তিকা আবরণী, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সেবা সহযোগিতা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ করা হইবে (বনখাতের উন্নয়নের পূর্বশর্ত -১)।
- বনখাতের উন্নয়নের সুফলসমূহ জনগণের মধ্যে সুষমভাবে বন্টন করিতে হইবে এবং বিশেষ করিয়া যাহাদের জীবন-জীবিকা বৃক্ষ বন ও বনভূমির উপর নির্ভরশীল, তাহাদেরকে এ খাতের উপকার ও সুফল প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে (বনখাতের উন্নয়নের পূর্বশর্ত-২) ।
- বন খাতের উন্নয়নে বনায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মহিলাসহ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হইবে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৃক্ষচাষি বন ব্যবহারকারী এবং যাহাদের জীবিকা বন ও বনভূমির উপর নির্ভরশীল তাহাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে (বনখাতের উন্নয়নের পূর্বশর্ত-৩) ।

- বনজ এবং বৃক্ষ সম্পদের সুষ্ঠু ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা উল্লেখিত সম্পদের উৎপাদন ক্ষমতাকে সংরক্ষণ পূর্বক ইহার সদ্ব্যবহার এবং জৈব পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে, যাহাতে এই সম্পদ গ্রামীণ ও জাতীয় উন্নয়নে ফলপ্রসু অবদান রাখিতে পারে (বনখাতের উন্নয়নের পূর্বশর্ত-৫) ।

জাতীয় বন নীতির উদ্দেশ্যসমূহ

বন নীতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে-

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগণের মৌলিক চাহিদা সমূহ পূরণের জন্য এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে বৃক্ষ ও বনের সার্বিক ভূমিকা আরও কার্যকরীভাবে সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বন ও বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমি এলাকার আয়তন বিশ ভাগে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন খালি জায়গা, কৃষি ফসল উৎপাদনের অনুপযুক্ত পতিত ও প্রান্তিক ভূমি এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বনহীন এলাকায় সরকারি বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে। সেই সঙ্গে ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে বনায়ন কার্যক্রমকেও উৎসাহিত করাসহ বনজ ফসল উৎপাদন সংশিষ্ট সেবাসমূহের অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে (জাতীয় বন নীতির উদ্দেশ্য -১)

জাতীয় বন নীতির ঘোষণাসমূহ

বন নীতির গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাসমূহের মধ্যে রয়েছে-

- দেশের সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ অত্যন্তসীমিত বিধায় সংরক্ষিত বনভূমির বাহিরে গ্রামীণ এলাকায়, উপকূলবর্তী অঞ্চলে জাগিয়া উঠা নতুন চরভূমিতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অশ্রেণিভুক্ত বৃক্ষহীন বনাঞ্চলে ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে {জাতীয় বন নীতির ঘোষণা (২)} ।

- সরকারি মালিকানাধীন প্রান্তিক ভূমি যথা সড়ক, রেলপথ ও সকল প্রকারের বাঁধের উভয়পার্শ্বে সরকারি উদ্যোগে এবং স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ও বেসরকারি সংস্থার অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হইবে {জাতীয় বন নীতির ঘোষণা (৫)} ।

- মাটি ও পানি সম্পদ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও উন্নয়নের নিমিত্তে সরকারি মালিকানাধীন, সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনের অন্তর্গত দেশের অভ্যন্তরে পার্বত্য জেলাসমূহ নদীর উৎস্য-মুখ এবং প্রাণীকুল ও উদ্ভিদকুলের প্রতিনিধিত্বকারী অঞ্চলসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অভয়ারণ্য জাতীয় পার্ক এবং প্রাকৃতিক সংরক্ষণ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিয়া সুরক্ষিত করা হইবে। ২০১৫ সালের মধ্যে এইরূপ সুরক্ষিত বনাঞ্চলের পরিমাণ সংরক্ষিত বনভূমির শতকরা ১০ ভাগে উন্নীত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে {জাতীয় বন নীতির ঘোষণা (৮)} ।

- সংকটপূর্ণ এলাকা যথা- পাহাড়ের খাড়া ঢাল, নাজুক জলবিভাজিকা, জলাভূমি ইত্যাদি বনাঞ্চলকে চিহ্নিত করিয়া রক্ষিত বন (প্রটেকটেড ফরেষ্ট) হিসাবে সংরক্ষণ করা হইবে {জাতীয় বন নীতির ঘোষণা (১১)} ।

- জাতীয় বন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে বন বিভাগকে শক্তিশালী করা হইবে এবং সামাজিক বনায়ন অধিদপ্তর নামে একটি নতুন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হইবে {জাতীয় বন নীতির ঘোষণা (২৭)} ।

মডিউল ৩

বাংলাদেশে বর্তমান জলাভূমি ও মৎস্য বিষয়ক আইনসমূহ

মডিউল ৩
বাংলাদেশে বর্তমান জলাভূমি ও মৎস্য বিষয়ক আইনসমূহ

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবেন ঃ

- জলাভূমির আইনগুলো কি এবং এর ব্যাখ্যা; এবং
- বাংলাদেশের মৎস্য বিষয়ক আইনসমূহ কি এবং এর ব্যাখ্যা।

সময় ঃ ১ ঘন্টা।

পদ্ধতি ঃ মুক্ত আলোচনা, ঝোড়ো ভাবনা, পাঠচক্র, কার্ড লিখন এবং দৃশ্যমান উপস্থাপনা।

উপকরণ ঃ হ্যান্ড আউট, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার, ভিপ কার্ড, পোস্টার এবং মাল্টিমিডিয়া।

প্রক্রিয়া ঃ

ধাপ-০১ # অধিবেশনে স্বাগত ও শুভেচ্ছা

- অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কুশল বিনিময় করুন।
- পূর্বের অধিবেশনের সূত্র ধরে আলোচনা শুরু করুন।
- বলুন, এখন আমরা বাংলাদেশে বর্তমান জলাভূমি ও মৎস্য বিষয়ক আইনসমূহ নিয়ে আলোচনা করবো।

ধাপ-০২ # জলাভূমির আইন

- প্রশিক্ষণার্থীদের মতে জলাভূমির আইন বলতে কি বুঝি তা একটি কার্ডের উপর লিখতে বলুন।
- কার্ডগুলো সংগ্রহ করে প্রশিক্ষক কার্ডের উপর লিখিত তথ্যসমূহ পুরো দলের উদ্দেশ্যে পড়ে শুনাবেন এবং তথ্যের ধরন অনুযায়ী সেগুলোকে সাজাবেন।
- এপর্যায়ে হ্যান্ড আউটের সহায়তায় জলাভূমি আইন ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ-০৩ # বাংলাদেশের মৎস্য বিষয়ক আইনসমূহ

- এবার অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন করুন, বাংলাদেশের মৎস্য বিষয়ক আইনসমূহ কি? তাঁদের উত্তরগুলো শুনুন এবং প্রয়োজনে ফিপ্ল চার্টে লিখুন।
- সবশেষে ছোট ছোট প্রশ্ন করে অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।
- ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

হ্যান্ড আউট-৩

বাংলাদেশে বর্তমান জলাভূমি ও মৎস্য বিষয়ক আইনসমূহ

জলাধার

পানি আইন, ২০১৩, ধারা ২(৫) অনুসারে জলাধার হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বা কৃত্রিমভাবে খননকৃত কোন নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, বাঁওড়, দীঘি, পুকুর,হ্রদ, ঝর্ণা বা অনুরূপ কোন ধারক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২

জলাভূমি সংরক্ষণঃ অনুচ্ছেদ ১৮ক

২০১১ সালে সংবিধানে ১৮ক অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধমে জলাভূমি সংরক্ষণকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ

২০১১ সালে সংবিধানে ১৮ক অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধমে জলাভূমি সংরক্ষণকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবে।

ধারা ৬ঙ

২০১০ সালে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ সংশোধনীর মাধ্যমে জলাধার সংরক্ষণের লক্ষ্যে ধারা ৬ঙ সংযোজন করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনভাবে শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না। তবে অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ শিথিল করা যাইতে পারে।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ

ধারা ২০

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কোন জলাধারে স্থাপনা নির্মাণ করে বা ভরাট করে বা জলাধার হতে মাটি বা বালু উত্তোলন করে জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ বা প্রবাহে বাধা সৃষ্টি বা গতিপথ পরিবর্তন বা পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারবে না ।

নির্বাহী কমিটি

ধারা ৯

এ ধারার বিধান অনুযায়ী গত ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি করা হয়েছে।

জলাধার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

ধারা ২২ (১)

আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে, নির্বাহী কমিটির নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে-

(ক) কোন প্রাকৃতিক বা অন্য কোন কারণে সুপেয় পানির তীব্র সংকট থাকায় সুপেয় পানির উৎস হিসাবে কোন দিঘি, পুকুর বা অনুরূপ কোন জলাধার সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন; বা

(খ) অতিথি পাখির নিরাপদ অবস্থান, অবাধ বিচরণ এবং অভয়াশ্রম নিশ্চিত করিবার জন্য কোন হাওর, বাঁওর বা অনুরূপ কোন জলাধার সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন,

তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি, সীমানা নির্ধারণ করিয়া, সুপেয় পানির উৎস হিসাবে সংশ্লিষ্ট জলাধার সংরক্ষণের জন্য উহার মালিক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সুরক্ষা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

ধারা ২২ (২)

নির্বাহী কমিটির কাছে যদি মনে হয় কোন জলাধার সংরক্ষণ করা প্রয়োজন তবে, নির্বাহী কমিটি সীমানা নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট জলাধার সংরক্ষণের জন্য তার মালিক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সুরক্ষা আদেশ প্রদান করতে পারবে।

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯

দেশের খাস জলাশয় ও জলামহালসমূহ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া এবং রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, প্রণয়ন ২০০৯ করেছে যা ২০১০ সালে সংশোধন করা হয়েছে। এ নীতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী, মৎস্যজীবীদের সংগঠন এবং জলমহাল-এর নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে-

প্রকৃত মৎস্যজীবীর সংজ্ঞা

নীতি ২ক

যিনি প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ শিকার ও বিক্রয় করে প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করেন তিনিই প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গন্য হবেন।

মৎস্যজীবী সংগঠন এর নিম্নরূপ সংজ্ঞা

নীতি ২খ

জলমহাল এমন জলাশয়কে বুঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাঁওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দিঘি, খাল, নদী সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত। এমন জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমঝোতা স্বারকের মাধ্যমে জলমহাল ব্যবস্থাপনা

২০০৯ সালের জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে জলমহাল অন্য মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর হতে পারে এবং তাদের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা হতে পারে। বর্তমান অবস্থায় বেশ কিছু জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয় হতে হস্তান্তরিত হয়ে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ অন্যন্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। উল্লেখিত জলমহালগুলির ব্যবস্থাপনা সমঝোতা স্মারকের আলোকে এবং প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনা করবেন।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি

নীতি ৩

বিভিন্ন মন্ত্রাণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দফতর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা

নীতি ৪

যুব সমাজের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ জলমহালসমূহ ইতিপূর্বে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইজারা প্রদান করা হতো। সে জন্য উল্লেখিত জলমহালগুলি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছিল। বর্তমানে উল্লেখিত জলমহালগুলি অন্যান্য জলমহালগুলির ন্যায় ইজারা প্রদান করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে যুব মৎস্যজীবীদের নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে।

২০ একরের উর্ধ্বে বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা

নীতি ৫

যুব সমাজের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ জলমহালসমূহ ইতিপূর্বে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইজারা প্রদান করা হতো। সে জন্য উল্লেখিত জলমহালগুলি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছিল। বর্তমানে উল্লেখিত জলমহালগুলি অন্যান্য জলমহালগুলির ন্যায় ইজারা প্রদান করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে যুব মৎস্যজীবীদের নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে।

উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০ একরের উর্ধ্বে বদ্ধ জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত বিধান

নীতি ৭

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০ একরের উর্ধ্বে সীমিত সংখ্যক জলমহাল ৬ বছরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা দেয়া যাবে। অতঃপর জেলা প্রশাসক, জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি তাদের মতামত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। আবেদনকারী আবেদনের সাথে ২০% জামানত প্রদান করবেন। অতঃপর সার্বিক বিবেচনা করে ভূমি মন্ত্রণালয় ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ইজারাকৃত জলমহাল সাবলিজ দেয়া সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা

নীতি ৯

ইজারাকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলিজ দেয়া যাবে না। যদি সাবলিজ দেয়া হয় তাহলে উক্ত জলমহালের ইজারা জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাতিল করবেন এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারার মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। এবং ঐ ইজারা গ্রহীতা পরবর্তী ৩ বছরের জন্য কোন জলমহাল ইজারার জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০

মৎস্য সংরক্ষণ ও রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত এ আইনে মাছের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে-

মাছের সংজ্ঞা

ধারা ২(২)

এ আইন অনুযায়ী সকল কাঁটা যুক্ত মাছ, বাগদা চিংড়ি, শলা চিংড়ি, উভচর প্রাণী, কচ্ছপ, শক্ত খোলশযুক্ত প্রাণী, ঝিনুক, শামুক জাতীয় কোমলাঙ্গ প্রাণী এবং জীবন বৃত্তান্তের সকল স্তরের ব্যাঙ "মাছ" এর অন্তর্ভুক্ত।

স্থিরকৃত ইঞ্জিন এর সংজ্ঞা

ধারা ২(৬)

স্থিরকৃত ইঞ্জিন (Fixed Engine) বলতে মাছ শিকারের জন্য মাটির সাথে সংযুক্ত বা অন্য কোন ভাবে স্থীরকৃত কোন জাল, খাঁচা (পিঞ্জর), ফাঁদ বা অন্য কোন কৌশলকে বুঝায়।

মৎস্য আইনে নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ কার্যক্রম

ধারা ৩

এ ধারা অনুযায়ী বিধি দ্বারা নিম্নলিখিত যে কোন বিষয় নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যথা-

- স্থিরকৃত ইঞ্জিনের স্থাপন ও ব্যবহার;
- স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কোন বাঁধ, বেড়ীবাঁধ, নদীতে আড়াআড়িভাবে দেয়া বা যে কোন প্রতিবন্ধক এবং অন্য কোন ধরনের কাঠামো নির্মাণ;
- যে কোন ধরনের মাছ ধরার জালের ব্যবহার ও প্রয়োগ পদ্ধতি এবং এরূপ জালের ফাঁসের আকার;
- মাছ ধরার জাল, ফাঁদ, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য কৌশলের উৎপাদন আমদানি, বাজারজাতকরণ, বহন, পরিবহন বা দখলে রাখা;
- আভ্যন্তরীণ জলরাশি বা রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমায় বিস্ফোরক দ্রব্য বন্দুক, তীরধনুক দ্বারা মাছ মেরে ফেলা বা মারার উদ্যোগ নিষিদ্ধ করতে পারে;
- পানিতে বিষ প্রয়োগ, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ বা অন্য কোনভাবে মাছ ধ্বংস করা বা এরকম উদ্যোগ গ্রহণ নিষিদ্ধ করতে পারে;
- যে মৌসুমে বা সময়ের মধ্যে কোন নির্ধারিত প্রজাতির মাছ ধরা বা বিক্রয় নিষিদ্ধ তা নির্ধারণ করতে পারে;
- সকল জলাশয়ে বা নির্ধারিত জলাশয়ে নির্ধারিত সময় কালের মধ্যে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করতে পারে।
- মৎস্য ক্ষেত্র শুকিয়ে ফেলা অথবা মৎস্য ক্ষেত্র থেকে পানি অপসারণের মাধ্যমে মাছ ধ্বংস বা ধ্বংসের উদ্যোগ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করতে পারেন।

তবে সরকার মৎস্য চাষ তথ্য সংগ্রহ, মৎস্য সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের শর্তসাপেক্ষে নিষিদ্ধ মৌসুমে বা নিষিদ্ধ জলাশয়ে বা সর্বনিম্ন সাইজের নিচে মাছ ধরার অনুমতি দিতে পারেন।

দণ্ড

ধারা ৫ (১)

কোন ব্যক্তি ধারা ৩ এ বর্ণিত কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে সর্বনিম্ন ১ বছর অথবা সর্বোচ্চ ২ বছর কারাদণ্ড বা ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। ।

কারেন্ট জাল এর সংজ্ঞা

ধারা ২(৫)

স্থানীয় ভাবে পরিচিত কারেন্ট জাল, জাপানি কারেন্ট জাল, ফান্দিজাল, ফাঁসজাল, ফাঁপাজাল, বাঁধাজাল, কাঠিজাল কারেন্ট জাল নামে পরিচিত। পরবর্তীতে মৎস্য রক্ষা সংরক্ষণ আইনের সংশোধনের মধ্য দিয়ে মনোফিলামেন্ট, সিনথেটিক নাইলন ফাইবার দিয়ে তৈরি বিভিন্ন আকারের জালের বুনন কে কারেন্ট জাল হিসেবে বলা হয়েছে।

কারেন্ট জাল ব্যবহার নিষেধাজ্ঞা

ধারা ৪ক

সকল প্রকার কারেন্টজাল উৎপাদন, বুনন, আমদানি, গুদামজাতকরণ, বহন, পরিবহন ও নিজের আয়ত্তে রাখা নিষিদ্ধ।

কারেন্ট জাল ব্যবহার এর দণ্ড

ধারা ৫(২)(খ)

সকল প্রকার কারেন্ট জাল উৎপাদন বুনন আমদানি গুদামজাতকরণের জন্য ৩-৫ বছর কারাদণ্ড ও ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। কারেন্ট জাল বহন পরিবহন নিজ আয়ত্তে রাখা ও ব্যবহারের জন্য ১-৩ বছরের কারাদণ্ড অথবা ৫,০০০(পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে।

সম্পূর্ণরূপে পানি শুকিয়ে বা আড়াআড়িভাবে বাঁধ নির্মাণে বাধানিষেধ সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন

ধারা ৩

এ ধারা অনুযায়ী মৎস্য ক্ষেত্র থেকে পানি নিষ্কাশনের দ্বারা কোন জলাশয়ের মৎস্য বিনাশ বা তৎমর্মে উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে, এ আইনে বিধি প্রণয়নের কথা বলা আছে। মৎস্যনীতি ১৯৯৮ এ খাল, বিল, ডোবা, নালা ও অন্যন্য জলাশয়কে পানি শূন্য করা যাবে না এবং আড়াআড়ি ভাবে স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী হোক কোন প্রকার বাঁধ নির্মাণ করা যাবে না।

মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৮৫

মৎস্য সংরক্ষণ ও রক্ষা আইন, ১৯৫০-এর ধারা ৩-এর ক্ষমতাবলে সরকার মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৮৫ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহের মধ্যে রয়েছে-

স্থিরকৃত ইঞ্জিন (কাঠা) ব্যবহার করে মাছ ধরা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ

বিধি ৩

কোন ব্যক্তি নদী-নালা খাল ও বিলে স্থিরকৃত ইঞ্জিন ব্যবহার বা স্থাপন নির্মাণ বা ব্যবহার করতে পারবে না। এই নিয়ম অমান্য করে মাছ ধরা হলে ধৃত মাছ আটক, অপসারণ এবং বাজেয়াপ্ত করা যাবে। এই নিয়মটি করার উদ্দেশ্য হলো কেউ যেন মাছ কে আটকিয়ে রাখার জন্য স্থিরকৃত ইঞ্জিন (কাঠা) ব্যবহার না করে।

মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়

বিধি ৭

প্রতি বছর ১লা এপ্রিল হতে ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত নদ-নদী, খাল-বিল অথবা নদী, খাল ও বিলের সাথে সাধারণত সরাসরি সংযুক্ত কোন জলাশয়ে দলবদ্ধভাবে বিচরণরত শোল, গজার এবং টাকি মাছের রেণু/পোনা এবং ঐ গুলির পাহারাদার হিসেবে বিচরণরত মূল মাছ মারা যাবে না; তবে শর্ত থাকে যে, পোনা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উপরে বর্ণিত জাতের পোনা এবং মূল মাছ ধরা বা ধ্বংস করবার ক্ষেত্রে উক্ত নিষেধ প্রযোজ্য হবে না।

মাছ ধরার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ

বিধি ৮(১)

মাছের প্রজাতি এবং সাইজ অনুসারে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছ ধরার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কার্পাস প্রজাতি যেমন- কাতলা, রুই, মৃগেল, কালিবাউশ এবং গনিয়া মাছসমূহ যা ২৩ সেন্টিমিটারের নীচে সেই সকল মাছ প্রতি বৎসর জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত, ইলিশ প্রজাতি (বাংলাদেশের কোন কোন অংশে জাটকা হিসেবে বহুল পরিচিত) যা ২৩ সেন্টিমিটারের নীচে প্রতি বৎসর নভেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত, পাংগাস প্রজাতির মাছের ক্ষেত্রে হিলসার নিয়ম প্রযোজ্য, সিলন, বোয়াল এবং আইড় প্রজাতির মাছ যা ৩০ সেন্টিমিটারের এর নীচে সেই সকল মাছ প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি হইতে জুন পর্যন্ত নিধন নিষিদ্ধ রয়েছে।

মৎস্য অভয়াশ্রম

মৎস্যনীতি, ১৯৯৮ তে বলা হয়েছে যে, মৎস্য অভয়াশ্রমের নিমিত্তে চিহ্নিত জলমহাল বা এর অংশ বিশেষ মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হবে। এছাড়া এই নীতি অনুযায়ী মৎস্য উৎপাদন, বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে উপযোগী জলাশয় ও জলমহাল ইত্যাদি এলাকার সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলা হবে।

মেরিন ফিশারিজ অর্ডিনেন্স, ১৯৮৩

বিদেশি মৎস্য শিকারি নৌযানের বাংলাদেশে মৎস্য জলাশয়ে প্রবেশের নিয়ম

বিধি ২০

সাধারণত কোন বিদেশি নৌযান মৎস্য শিকারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মৎস্য জলাশয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। তবে বাংলাদেশ-কর্তৃপক্ষের নিকট হতে লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক প্রবেশ করতে পারবে এবং লাইসেন্সে বর্ণিত শর্ত মোতাবেক মৎস্য শিকার করতে পারবে ।

বিস্ফোরক এর ব্যবহার

বিধি ২৬

মৎস্য নিধন বা সহজে মাছ ধরবার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক, বিষ ও অন্যান্য ক্ষতিকর দ্রব্য প্রয়োগ বা প্রয়োগের উদ্যোগ বা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে উক্ত দ্রব্য বহন বা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা, নির্ধারিত নিষিদ্ধ মৎস্য আহরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা বা নিষিদ্ধ মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম নৌযানে রাখাকে অত্র আইনে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। অত্র আইনের অধীন প্রণীত বিধি লঙ্ঘন করে কোন মৎস্য আহরণ করা হলে বা যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও জেনে শুনে উক্ত মাছ গ্রহণ বা নিজ দখলে রাখলে একই অপরাধ হবে বলে বলা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি উল্লেখিত অপরাধে অপরাধী হয় সে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা জরিমানা বা নিষিদ্ধ উপায়ে আহরিত মৎস্যের ১৫ গুণ এই দুইয়ের মধ্যে যা বেশি সেই অঙ্কের টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

সামুদ্রিক রিজার্ভে নিষিদ্ধ কার্যক্রম

ধারা ২৯

সামুদ্রিক রিজার্ভে মাছ শিকার, ড্রেজিং ইত্যাদি নিষিদ্ধ। সামুদ্রিক রিজার্ভে অনুমতি ছাড়া মাছ শিকার করে বা তৎমর্মে উদ্যোগ গ্রহণ করে; অথবা ড্রেজিং করে, বালি ও কাঁকড় নিষ্কাশন করে, বর্জ্য পদার্থ বা অন্য কোন দূষিত পদার্থ নিক্ষেপ করে বা জমা করে অথবা অন্য কোনভাবে মাছ বা মাছের প্রজনন ক্ষেত্র বা আবাসস্থলের ব্যাঘাত ঘটায়, পরিবর্তন বা ধ্বংস করে; অথবা উক্ত রিজার্ভমুক্ত কোন ভূমি বা জলাশয়ে বিল্ডিং বা অন্য কোন গৃহাদি নির্মাণ বা উত্তোলন করে, তবে সে একটি অপরাধে অপরাধী হবে এবং অনধিক এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হবে। উল্লেখিত নিষিদ্ধ কাজ করবার অনুমতি প্রদান করা যায় যদি রিজার্ভের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যের জন্য অনুরূপ কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

মৎস্য সংরক্ষণে অন্যান্য বিধান

ডিমওয়ালা মাছ সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক প্রজনন বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিধিবিধানগুলো

আমাদের দেশে প্রায় সারা বৎসর ইলিশ মাছ ধরা হলেও প্রতি বৎসর আগস্ট হতে অক্টোবর মাসে সবচেয়ে বেশি পরিমানে মাছ (৬০-৬৫%) ধরা পড়ে। উক্ত সময়ে প্রায় ৭০-৮০% মাছ পূর্ণমাত্রায় পরিপক্ক থাকে এবং অক্টোবর মাসের বড় পূর্ণিমার "জো" এর সময় সবচেয়ে বেশি পরিমানে ডিম ছেড়ে থাকে। বৎসরের পর বৎসর ক্রমাগতভাবে এ সময়ে ব্যাপকভাবে পরিপক্ক মাছ ধরার ফলে প্রাকৃতিকভাবে ইলিশ মাছের ডিম উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। কাজেই প্রাকৃতিকভাবে অধিক ডিম উৎপাদনের জন্য অক্টোবর মাসের বড় পূর্ণিমার "জো" এর সময় প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রে কিছুদিন মাছ আহরণ বন্ধ রাখা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে মেঘনা নদীর মোহনায় ইলিশ মাছের প্রধান প্রজনন এলাকার উক্ত বড় পূর্ণিমার ১০ দিনের এক "জো", ৩০ আশ্বিন হতে ৯ কার্তিক পর্যন্ত (১৫-২৪ অক্টোবর) ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ আইন প্রণয়ন করে ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।

মৎস্য নীতি-১৯৯৮

মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও এর প্রবৃদ্ধির পরিপন্থী বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানারূপ প্রতিকূল পরিবর্তন, উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির অভাব কিংবা প্রাপ্তিসাধ্য জনশক্তির যথাযথ ব্যবহার না হওয়া, প্রতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি ছাড়াও সর্বোপরি মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি জাতীয় মৎস্য নীতির অভাব এই সেক্টরের আশানুরূপ উন্নয়ন না হওয়ার অন্যতম কারণ। এ সকল প্রতিবন্ধকতার অবসান করে মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতিকল্পে জাতীয় মৎস্য নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে এর উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলো-

জাতীয় মৎস্য নীতির উদ্দেশ্যাবলি

১. মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
২. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
৩. প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ ;
৪. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন; এবং
৫. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্যর উন্নয়ন।

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতি (নীতি ৫.০)

নীতি ৫.২

মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ইজারা প্রথা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে প্রকৃত মৎস্যজীবিদের অনুকূলে উৎপাদনভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হবে এবং মৎস্য আহরণ সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় সীমিত রাখা হবে ।

নীতি ৫.২.১

মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ইজারা প্রথা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে প্রকৃত মৎস্যজীবিদের অনুকূলে উৎপাদনভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হবে এবং মৎস্য আহরণ সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় সীমিত রাখা হবে ।

নীতি ৫.২.২

মৎস্যজীবী সংগঠন ও স্থানীয় সরকারসমূহের মাধ্যমে চিহ্নিত মৎস্য অভয়াশ্রমসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর দায়িত্ব পালন করবে। চিহ্নিত জলাশয়সমূহের বরাদ্দ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

নীতি ৫.২.৩

মৎস্য অভয়াশ্রমের নিমিত্তে চিহ্নিত জলমহাল বা এর অংশবিশেষ মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরিত হবে।

নীতি ৫.৩

বিল, হাওড় ও অন্যান্য প্লাবন ভূমিতে বিশেষ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পসমূহের অন্তর্ভুক্ত বাঁধ পরিবেষ্টিত অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ির পোনা ছেড়ে মাছ ও ধান চাষের সমন্বিত মডেল সম্প্রসারণ করা হবে ।

অভ্যন্তরীণ বদ্ধজলাশয়ের মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা নীতি (নীতি ৬.০)

নীতি ৬.১

দেশের সকল পুকুর ও দিঘি এবং অন্যান্য জলাশয়ে মৎস্য চাষ উৎসাহিত করা হবে। বিদেশি প্রজাতির মাছের চাষ প্রবর্তনের পূর্বে ঐ প্রজাতির মাছ দেশিয় প্রজাতির মাছের উপর কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে কিনা এবং পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য ক্ষতিকারক হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করত ফলাফল ইতিবাচক হলে কেবল ঐ সকল বিদেশি প্রজাতির মাছের চাষ উৎসাহিত করা হবে ।

নীতি ৬.৩

মৎস্য চাষে মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ ও তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

নীতি ৬.৪

ভাসমান দরিদ্র মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বিকল্প উপার্জনের উৎসের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে হাওড়, বাঁওড় ও সম্ভাব্য অন্যান্য জলাশয়ে মৎস্য চাষের উপর বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

নীতি ৬.৪.১

সরকারি খাস দিঘি, পুকুর কিংবা অন্যান্য জলাশয় সংশ্লিষ্ট এলাকার বিত্তহীন প্রান্তিক চাষি ও গরিব মৎস্যচাষি, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেকার যুবক/যুব মহিলা ও লক্ষ্য জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘমেয়াদে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক দরপত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। দরপত্র লব্ধ আয়ের অর্থ নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসারে সরকারি খাতে কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ তহবিলে জমা হবে।

মডিউল ৪

পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনার আইন ও নীতিসমূহ

মডিউল ৪
পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনার আইন ও নীতিসমূহ

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণঃ

- পরিবেশ, প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও দূষণ এর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ ও বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০) অবহিত হবেন;
- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর ধারণা পাবেন; এবং
- করাতকল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২ জানতে পারবেন।

সময় ঃ ১ ঘন্টা।

পদ্ধতি ঃ মুক্ত আলোচনা, ঝোড়ো ভাবনা, পাঠচক্র, দলীয় কাজ এবং দৃশ্যমান উপস্থাপনা।

উপকরণ ঃ হ্যান্ড আউট, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার, ভিপ কার্ড, পোস্টার এবং মাল্টিমিডিয়া।

প্রক্রিয়া ঃ

ধাপ-০১ # অধিবেশনে স্বাগত ও শুভেচ্ছা

- অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কুশল বিনিময় করুন।
- পূর্বের অধিবেশনের সূত্র ধরে আলোচনা শুরু করুন।
- বলুন, এখন আমরা পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনার আইন ও নীতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করবো।

ধাপ-০২ # পরিবেশ, প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও দূষণ এবং পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ ও বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০)

- পরিবেশ বলতে কি বোঝায়? প্রশ্নটা করে আলোচনা শুরু করুন। তারপর প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও দূষণ কি তা নিয়ে আলোচনা করুন। একইভাবে পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ ও বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০) বলতে কি বোঝায় তা অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন করে জেনে নিন? তাঁদের উত্তরগুলো শুনে নিয়ে এ সম্পর্কে কোন কিছু যোগ করার থাকলে তা করুন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে হ্যান্ড আউটের সহায়তা নিন।

ধাপ-০৩ # পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

- পাঠচক্রের জন্য অংশগ্রহণকারীদের ২টি দলে ভাগ করুন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় দলকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ আলোচনার জন্য দিন।
- এবার প্রতিটি দলকে বলুন, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ দলের মধ্যে আলোচনা করে সারসংক্ষেপ সবার সামনে উপস্থাপন করতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ হ্যান্ড আউটটি দলের মধ্যে সরবরাহ করুন। আলোচনার জন্য সময় দিন ১৫ মিনিট।
- নির্দিষ্ট সময়ের শেষে প্রতিটি দলকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনের সময় গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু বাদ পড়লে হ্যান্ড আউট থেকে তা যোগ করুন।

ধাপ-০৪ # ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩

- ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ নিয়ে আলোচনা করার জন্য ২টি শিরোনাম (যথা- ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর বিভিন্ন ধারা এবং শাস্তিসমূহ) লেখা ২টি পোস্টার ২টি দেয়ালে লাগিয়ে দিন।
- এবার অংশগ্রহণকরীদের ঘুরে ঘুরে প্রতিটি পোস্টারে ১টি করে ধারার নাম ও শাস্তি লিখতে বলুন। লেখার জন্য সময় দিন ১৫মিনিট।

ধাপ-০৫ # করাতকল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২

- এবার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, করাতকল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২ কি? তাঁদের উত্তরগুলো শুনার পর হ্যান্ড আউটের সহায়তা নিয়ে করাতকল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২ সম্পর্কে আলোচনা করে ধারণা পরিষ্কার করুন।
- সবশেষে ছোট ছোট প্রশ্ন করে অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।
- ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

হ্যান্ড আউট-৪

পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনার আইন ও নীতিসমূহ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ অইন, ১৯৯৫ পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই এ আইনে কিছু সংজ্ঞা প্রদান করা হয় যা নিম্নরূপ-

পরিবেশঃ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ {ধারা ২(ঘ)}

"পরিবেশ" অর্থ পানি, বায়ু, মাটি ও ভৌত সম্পদ ও ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্কসহ ইহাদের সহিত মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও অণুজীবের বিদ্যমান পারস্পারিক সম্পর্ক

প্রতিবেশ ব্যবস্থাঃ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ {ধারা ২(ছ)}

"প্রতিবেশ ব্যবস্থা" অর্থ পরিবেশের উপাদানসমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ভারসাম্যযুক্ত জটিল সম্মিলন, যাহা উদ্ভিদও প্রাণীকুলের সংরক্ষণ ও বিকাশকে সহায়তা ও প্রভাবিত করে

দূষণঃ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ {ধারা ২(খ)}

"দূষণ" অর্থ বায়ু পানি বা মাটির তাপ, স্বাদ, গন্ধ, ঘনত্ব বা উহাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনসহ বায়ু, পানি বা মাটির দূষিতকরণ বা উহাদের ভৌতিক, রাসায়নিক বা জৈবিক গুণাবলির পরিবর্তন, অথবা বায়ু, পানি, মাটি বা পরিবেশের অন্য কোন উপাদানের মধ্যে তরল, গ্যাসিয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় বা অন্য কোন পদার্থের নির্গমনের মাধ্যমে বায়ু, পানি, মাটি, গবাদি পশু, বন্যপ্রাণী, পাখি, মৎস্য, গাছপালা বা অন্য সব ধরনের জীবনসহ জনস্বাস্থ্য ও গৃহকর্ম, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, বিনোদন বা অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক, অহিতকর বা ধংসাত্মক কার্য।

পরিবেশ নীতি, ১৯৯২

পরিবেশ নীতির উদ্দেশ্য (নীতি ২)

- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন।
- দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে রক্ষা।
- সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয় মূলক কর্মকাণ্ড সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।
- সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
- সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহারের নিশ্চিয়তা বিধান।
- পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সহিত যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা।

পরিবেশ ও আইনগত কাঠামো (নীতি ৪)

- পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং দূষণ ও অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের সহিত সম্পর্কিত সকল বর্তমান আইন সময়োপযোগী করিয়া সংশোধন।
- পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়ন।
- প্রাসঙ্গিক সকল আইনের বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ এবং এতদসম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টিকরণ।
- পরিবেশ সংক্রান্ত যে সকল আন্তর্জাতিক আইন/কনভেনশন/প্রটোকল বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য তাহা অনুমোদনকরণ এবং ঐ সকল আইন/কনভেনশন/প্রটোকলের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের সংশোধন/পরিবর্তন সাধন।

পরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (নীতি ৫)

- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এই নীতি বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয় করিবে।
- এই নীতি বাস্তবায়নের কাজে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিবেশ কমিটি গঠন করিবে।
- ভবিষ্যতে দেশের পরিবেশগত অবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এই নীতি যথাযথভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর সকল ইআইএ এর চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রদান করিবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন. ১৯৯৫ (সংশোধনী. ২০১০)

পরিবেশ নীতিমালায় ঘোষিত নীতিসমূহকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও এ আইনের অধীনে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ প্রণয়ন করা হয়। এ আইন ও বিধিমালা দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে মূল আইন হিসেবে পরিচিত। নিম্নে এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলো আলোচনা করা হলো-

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা

ধারা ৫

সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে তাহা হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) ঘোষণা করিতে পারিবে এবং অবিলম্বে উক্ত সংকটাপন্ন অবস্থা হইতে উত্তোরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

ধারা ৫ (২)

উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সকল প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট এলাকার সীমানা ও মানচিত্রসহ আইনগত বর্ণনার উল্লেখ থাকিবে এবং এই সকল মানচিত্র ও আইনগত বর্ণনা সংশ্লিষ্ট এলাকাতে প্রদর্শিত হইবে এবং তাহা উক্ত এলাকার দালিলিক বর্ণনা হিসাবে বিবেচিত হইবে।

ধারা ৫ (৩)

কোন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার পর সরকার সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে।

ধারা ৫ (৪)

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন বলিয়া ঘোষিত এলাকায় কোন কোন ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা সরকার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

ধারা ১৫

ধারা ৫ এর বিধান লঙ্ঘনের প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন্য ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

পাহাড় কাটা সম্পর্কে বাধা-নিষেধ

ধারা ৬খ

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন (cutting and/or razing) করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে কোন পাহাড় বা টিলা কর্তন বা মোচন করা যাইতে পারে।

জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ

ধারা ৬(ঙ)

আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনভাবে শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ শিথিল করা যাইতে পারে।

ধারা ১৫

ধারা ৬(ঙ) এর বিধান লঙ্ঘনের প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন্য ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন্য ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড প্রদান করা হইবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের ২০ ধারার ক্ষমতাবলে সরকার ১৯৯৭ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা প্রণয়ন করে। নিম্নে এ বিধিমালার গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলো তুলে ধরা হলো-

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা (বিধি ৩)

বিধি ৩(১)

ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) বিধান অনুসারে কোন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করার নিমিত্তে সরকার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখিবে, যথা:- মানববসতি, প্রচীন স্মৃতিসৌধ, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, গেম রিজার্ভ, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ, বনাঞ্চল, এলাকাভিত্তিক জীববৈচিত্র্য এবং এতদ্‌সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।

বিধি ৩(২)

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন কোন কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা সরকার বিধি ১২ ও ১৩ এ বর্ণিত মানমাত্রা অনুসারে নির্দিষ্ট করিবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সরকার এ বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে সময়ে সময়ে গেজেট প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে বিভিন্ন গুরূত্বপূর্ণ স্থানকে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করেছে এবং সেখানে কিছু কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা

পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে যদি কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয় বা ভবিষ্যতে আরো অবনতি হবার আশংকা থাকে তবে ঐ সমস্ত এলকাকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা বা ইসিএ (Ecologically Critical Area-ECA) বলা হয়।

উদ্ভিদ, প্রাণী এবং পরিবেশের অন্যান্য উপাদানসমূহের মধ্যেকার পারস্পারিক ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক নিয়েই গঠিত হয় কোন স্থানের প্রতিবেশ ব্যবস্থা। কিন্তু মানুষের অপরিকল্পিত কার্যকলাপের কারণে দেশ জুড়ে প্রতিবেশ ব্যবস্থা দিন দিন ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে বা ভবিষ্যতে আরো অবনতি হবার আশংকা আছে সে কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশের গুণগত মান উন্নয়ন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৫নং ধারার উপধারা (১) এবং ৪নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সুন্দরবন, কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সমুদ্রসৈকত, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, সোনাদীয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, মারজাত বাওড়, গুলশান লেক, বুড়িগঙ্গা নদী, শীতলক্ষ্যা নদী, বালু নদী ও তুরাগ নদীকে ইসিএ ঘোষণা করেছে এবং উল্লেখিত এলাকায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হয়েছে-

- প্রাকৃতিক বন ও গাছ পালা কর্তন ও আহরণ;
- সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা;
- ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ;
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ;
- ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ;
- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দদূষণকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- মাছ ও অন্যান্য জলজপ্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী।

এসকল বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অনধিক ১০ (দশ) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩

পরিবেশ সংরক্ষণে উপরোক্ত আইন ও বিধিমালা ছাড়াও বিশেষ কিছু আইন পরিবেশ দূষণরোধে অতি প্রয়োজনীয় ও জরুরি। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে তাই সরকার ২০১৩ সালে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। এ আইনের নিম্নরূপ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান তুলে ধরা হলো-

ইটভাটার লাইসেন্স গ্রহণের বিধিনিষেধ ও শাস্তি

ধারা ৪

ইটভাটা যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে, কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট প্রস্তুত করিতে পারিবে না। তবে শর্ত থাকে যে, কংক্রিট কম্প্রেসড ব্লক ইট প্রস্তুত করিবার ক্ষেত্রে এইরূপ লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না। "কংক্রিট কম্প্রেসড ব্লক ইট" অর্থ কংক্রিট, বালি ও সিমেন্ট দ্বারা তৈরি কোন ইট ।

ধারা ১৪

এ আইনের ধারা ১৪-এ বলা হয়েছে এ ধারার (ধারা ৪) বিধান লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি হবে অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।

কৃষিজমি বা পাহাড় বা টিলা সুরক্ষা

ধারা ৫(১)

কোন ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিজমি বা পাহাড় বা টিলা হইতে মাটি কাটিয়া বা সংগ্রহ করিয়া ইটের কাঁচামাল হিসাবে উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

ধারা ১৫

ধারা ৫(১) এর বিধান লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড হইবে।

মজা পুকুর বা খাল বা বিল বা খাঁড়ি বা দিঘি বা নদ-নদী বা হাওর-বাঁওর বা চরাঞ্চল বা পতিত জায়গা থেকে মাটি সংগ্রহ করা

ধারা ৫(২)

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত, কোন ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্যে মজা পুকুর বা খাল বা বিল বা খাঁড়ি বা দিঘি বা নদ-নদী বা হাওর-বাঁওর বা চরাঞ্চল বা পতিত জায়গা হতে মাটি কাটিতে বা সংগ্রহ করিতে পারিবে না ।

ধারা ১৫

উপধারা ৫(১) (২)-এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার শাস্তি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড হইবে।

মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসকরণ

ধারা ৫(৩)

ইটের কাঁচামাল হিসাবে মাটির ব্যবহার হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটায় কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ ফাঁপা ইট (Hollow Brick) প্রস্তুত করিতে হইবে।

ধারা ১৫

৫(৩)-এর বিধান লঙ্ঘনের শাস্তি অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হবে।

ব্যক্তি ভারী যানবাহন দ্বারা ইট বা ইটের কাঁচামাল পরিবহন

ধারা ৫(৪)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত উপজেলা বা ইউনিয়ন বা গ্রামীণ সড়ক ব্যবহার করে কোন ব্যক্তি ভারী যানবাহন দ্বারা ইট বা ইটের কাঁচামাল পরিবহন করিতে পারিবে না।

ধারা ১৫

ধারা ৫ (৪) লঙ্ঘনের শাস্তি অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হবে।

জ্বালানি হিসাবে কোন জ্বালানি কাঠ ব্যবহার

ধারা ৬

এ ধারায় বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি হিসাবে কোন জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

ধারা ১৬

এ ধারার বিধান লঙ্ঘনের শাস্তি অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড প্রদান করা হইবে।

কয়লার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

ধারা ৭

কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত সালফার, এ্যাশ, মারকারি বা অনুরূপ উপাদান সম্বলিত কয়লা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

ধারা ১৭

এ ধারা ৭ এর বিধান লঙ্ঘন করলে তাহার শাস্তি অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হবে।

ইটভাটা স্থাপনের নিষিদ্ধ এলাকা

ধারা ৮(১)

ছাড়পত্র থাকুক বা না থাকুক এই আইন কার্যকর হইবার পর নিম্নবর্ণিত এলাকার সীমানার অভ্যন্তরে কোন ব্যক্তি কোন ইটভাটা স্থাপন করিতে পারিবেন না-

(ক) আবাসিক, সংরক্ষিত বা বাণিজ্যিক এলাকা;
(খ) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা উপজেলা সদর;
(গ) সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন বন, অভয়ারণ্য, বাগান বা জলাভূমি;
(ঘ) কৃষি জমি;
(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা;
(চ) ডিগ্রেডেড এয়ার শেড (Degraded Air Shed) ।

ধারা ৮(২)

নিষিদ্ধ এলাকার সীমানার অভ্যন্তরে ইটভাটা স্থাপনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কোন আইনের অধীন কোনরূপ অনুমতি বা ছাড়পত্র বা লাইসেন্স, যে নামেই অভিহিত হউক, প্রদান করিতে পারিবে না ।

ধারা ৮(৩)

পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত দূরত্বে বা স্থানে ইটভাটা স্থাপন করিতে পারিবেন না, যথা: -

(ক) নিষিদ্ধ এলাকার সীমারেখা হইতে ন্যূনতম ১ (এক) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;
(খ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত, সরকারি বনাঞ্চলের সীমারেখা হইতে ২ (দুই) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;
(গ) কোন পাহাড় বা টিলার উপরিভাগে বা ঢালে বা তৎসংলগ্ন সমতলে কোন ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে উক্ত পাহাড় বা টিলার পাদদেশ হইতে কমপক্ষে অর্ধ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;
(ঘ) পার্বত্য জেলায় ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে, পার্বত্য জেলার পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে;
(ঙ) বিশেষ কোন স্থাপনা, রেলপথ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বা অনুরূপ কোন স্থান বা প্রতিষ্ঠান হইতে কমপক্ষে ১ (এক) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে; এবং
(চ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত উপজেলা বা ইউনিয়ন বা গ্রামীণ সড়ক হইতে কমপক্ষে অর্ধ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে।

ধারা ৮(৪)

এই ধারা কার্যকর হইবার পূর্বে, ছাড়পত্র গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি যদি নিষিদ্ধ এলাকার সীমানার মধ্যে বা উপ-ধারা (৩) এ উল্লেখিত দূরত্বের মধ্যে বা স্থানে ইটভাটা স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি, এই আইন কার্যকর হইবার ২ (দুই) বৎসর সময়সীমার মধ্যে, উক্ত ইটভাটা, এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে, যথাস্থানে স্থানান্তর করিবেন, অন্যথায় তাহার লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাইবে।

ধারা ৮ অনুযায়ী-

- **"আবাসিক এলাকা"** অর্থ এমন কোন এলাকা যেখানে কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) টি পরিবার বসবাস করে;
- **"জলাভূমি"** অর্থ কোন ভূমি যাহা বৎসরের ৬ (ছয়) মাস বা তদূর্ধ্ব সময় পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে এবং যাহা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত;
- **"প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা"** অর্থ পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত কোন এলাকা;
- **"বাগান"** অর্থ এমন কোন স্থান যেখানে হেক্টর প্রতি কমপক্ষে ১০০ (একশত) টি ফলজ বা বনজ বা উভয় প্রকারের বৃক্ষ রহিয়াছে, এবং চা বাগানও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং
- **"ব্যক্তিমালিকানাধীন বন"** অর্থ এমন কোন বন যাহা বন অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যক্তি মালিকানাধীন বন হিসাবে স্বীকৃত এবং যাহার গাছপালার আচ্ছাদন (crown cover) বনের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) ভাগ এলাকায় বিস্তৃত থাকে, এবং সামাজিক বন বা গ্রামীণ বনও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ধারা ১৮

কোন ব্যক্তি ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড এবং ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর শর্তাবলি লঙ্ঘন অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড প্রদান করা হইবে।

করাতকল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২

করাত-কল স্থাপন বা পরিচালনার ক্ষেত্রে পালনীয় শর্তাদি

বিধি ৭(১)

নিম্নবর্ণিত স্থানে করাত-কল স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না, যথা: -

- সংরক্ষিত, রক্ষিত, অর্পিত বা অন্য যে কোন ধরনের সরকারি বন ভূমির সীমানা হইতে ন্যূনতম ১০(দশ) কিলোমিটারের মধ্যে, বা বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্থল সীমানা হইতে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) কিলোমিটারের মধ্যে, পৌর এলাকা ব্যতীত;
- কোন সরকারি অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিনোদন পার্ক, উদ্যান এবং জনস্বাস্থ্য বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা বিঘ্ন সৃষ্টি করে এইরূপ কোন স্থানে ন্যূনতম ২০০(দুইশত) মিটার এর মধ্যে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধি কার্যকর হইবার তারিখে এই বিধিতে উল্লেখিত কোন স্থানে কোন করাত-কল স্থাপিত হইয়া থাকিলে বা স্থাপিত করাত-কল পরিচালনাধীন থাকিলে উহা কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে অনূন্য ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে করাত-কল মালিক উক্ত করাত-কল বন্ধ করিয়া দিবেন, অন্যথায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা বন্ধ করিবার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বিধি ৭(২)

সকাল ৬.০০ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকা সময়সীমার পূর্বে বা পরে কোন করাত-কল পরিচালনা করা যাইবে না।

বিধি (৩)

কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এবং (২) এর বিধিান লঙ্ঘন করিলে উহার ক্ষেত্রে বিধি ১২ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

লাইসেন্স বাতিল

বিধি ৮(১)

দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত কারণে কোন করাত-কলের লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন, যথা: -

- বিধি ৭ এবং লাইসেন্সে উল্লেখিত শর্তাবলি লঙ্ঘন করিলে; বা
- কোন করাত-কল মালিক বা উহা পরিচালনাকারী কোন ব্যক্তি আইন বা বিধিমালার অধীন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে।

বিধি ৮(২)

উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি বিধি ৬ এ নির্ধারিত সময়ে {লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ৩ (তিন) মাসের মধ্যে} নবায়নের জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে তদ্‌বরাবরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

বিধি ৮(৩)

উপ-বিধি (১) অনুসারে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স বাতিল করা হইলে বা উপ-বিধি (২) অনুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাইসেন্স বাতিল হইলে কোন করাত-কল মালিক বা ব্যক্তি উহার পরিচালনা অব্যাহত রাখিলে, তাহার ক্ষেত্রে বিধি ১২ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

বিধি ১২

কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূন্য দুইমাস বা অনধিক তিন বছর কারাদণ্ড এবং উহার অতিরিক্ত নূন্যতম দুই হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫

উপকূরীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ এর উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে-

নীতির কাঠামো (নীতি ৪)

- সরকার উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ঘোষণা করেছে উন্নয়নের জন্য
- এই নীতি উপকূলীয় জনগণকে সাধারণ নির্দেশনা দেয় যেন তারা নিরাপদ জীবিকা নির্বাহ করতে পারে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি সাধন না করে

অর্থনৈতিক উন্নয়ন (নীতি ৪.১)

উপকূলীয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে দরিদ্রতা হ্রাসের জন্য। এ ক্ষেত্রে নীতিগুলো হচ্ছেঃ

- বার্ষিক উন্নয়ন হার বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হবে, যা প্রয়োজন জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য তথা দারিদ্র হ্রাস এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য
- উপকূলীয় অঞ্চলে বিদ্যমান সুযোগসমূহ টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যবহার করা উচিত যাতে উপকূলীয় কমিউনিটির স্বাভাবিক জীবনের উন্নয়ন হয় বিভিন্ন সেক্টরে বিনিয়োগের দ্বারা যেমন সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ, লবণ উৎপাদন, চিংড়ি চাষ, কাঁকড়া চাষ, ঝিনুক চাষ, মুক্তা চাষ, গবাদিপশুর উন্নয়ন, এলাকা ভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্প, পরিবহন, জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ ভাঙা, পর্যটন, সৈকতের খনিজ পদার্থ উত্তোলন, নবায়নযোগ্য এবং অ-নবায়নযোগ্য শক্তি ইত্যাদি
- উন্নয়নের সকল পদ্ধতি বিবেচনায় নিয়ে দরিদ্রতার বহুমাত্রিক ধরন অনুযায়ী একটি কৌশল প্রবর্তন করা হবে

জীবিকায়নের মৌলিক চাহিদা ও সুযোগসমূহ (নীতি ৪.২)

উপকূলীয় জনগণের মৌলিক চাহিদা এবং জীবিকায়নের সুযোগসমূহ বৃদ্ধির জন্য, সরকারী নীতি হবেঃ

- চাকরির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস এবং জীবিকায়নের সুযোগসমূহ সৃষ্টি করাই হবে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল নীতি
- প্রাথমিক শিক্ষার ব্যপ্তি, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন এবং নিরাপদ পানি পানের সুযোগসমূহ বৃদ্ধি করতে হবে
- খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উৎপাদন চলমান রাখতে হবে এবং উচ্চ মূল্যের বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যের অধিক উৎপাদন করতে হবে

বিপদাপন্নতা হ্রাসকরণ (নীতি ৪.৩)

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অধিকাংশ পরিবার বিপদাপন্ন হচ্ছে। বিপদাপন্নতা হ্রাসকরণে সরকারী নীতি হবেঃ

- দারিদ্র হ্রাসের জাতীয় কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপদাপন্নতা হ্রাসকরণ
- উপকূলীয় অঞ্চলকে সমন্বয় সাধন করতে হবে 'সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা'র সাথে
- দুর্যোগের সময় দরিদ্রদের খাপ খাওনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে ইনস্যুরেন্স স্কিম প্রবর্তন করতে হবে

প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা (নীতি ৪.৪)

উপকূলীয় অঞ্চল বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুরঃ অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদ ও চিংড়ি, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ, প্যারাবন ও অন্যান্য বন, ভূমি, গবাদিপশু, লবণ, খনিজ, নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস্যসমূহ যেমন ঢেউ, বাতাস এবং সৌর শক্তি। মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদী সরকারের নীতি টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য অনুসরণ হিসাবে উভয় জৈবিক এবং অজৈবিক উপকূলীয় সম্পদ হবেঃ

- আন্তর্জাতিক সব নদী যেগুলো উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে এগুলি রক্ষার জন্য সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নেওয়া হবে
- উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে নবায়নযোগ্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনায় এবং, এর সীমা, নিয়ন্ত্রিত আহরণ, ও তাদের পুনর্জন্ম সংশ্লিষ্ট চক্র নিষ্কাশন বা ব্যবহারে
- উপকূলীয় সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। সম্পদ ব্যবহারে সম্বয়, যেমন কৃষি, বনজ এবং মাছ ধরা, জলচাষ সহ হয় প্রধান অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। এগুলো টেকসই করতে চেষ্টা করতে হবে।

ভূমি (নীতি ৪.৪.১)

- ভূমির অপরিকল্পিত ও যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিকল্পনা করতে হবে ভূমি ব্যবহার নীতির অধীনে। নতুন চরের জন্য কৌশল তৈরী করতে হবে। আঞ্চলিকতার প্রবিধান প্রণয়ন করা হবে এবং যথাসময়ে জারি করা হবে
- এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার মাধ্যমে, সমুদ্র এবং নদী থেকে পুনরুদ্ধার পাওয়া সুস্থিত ভূমির জন্য সরকার সঠিক পরিকল্পনা এবং স্কিম বাস্তবায়ন করবে

পানি (নীতি ৪.৪.২)

- সমুদ্র থেকে মাটিতে লবণাক্ততা অনুপ্রবেশের দ্বারা হুমকির সম্মুখীন উপকূলীয় মোহনার পানির চ্যানেলগুলির প্রতিবেশ রক্ষায় উজানের পর্যাপ্ত পানি প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে
- উপকূলীয় এলাকার ক্ষুদ্র সেচ উন্নত করার জন্য ছোট জলাধার তৈরী করতে হবে জোয়ারের পানি ধরে রাখার জন্য। স্বাদু পানি সঞ্চয় এবং অন্যান্য পানি ব্যবহারের জন্য বিদ্যমান ব্যবহৃত পোল্ডারের অবকাঠামোর মধ্যে সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে

আহরণকৃত মৎস্যসম্পদ (নীতি ৪.৪.৩)

- সমন্বিত নীতিগুলো, যা জাতীয় মৎস্য নীতিতে ব্যবহৃত হয়, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় তা অনুসরণ করতে হবে
- উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্যজীবিদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে

জলজচাষ (নীতি ৪.৪.৪)

- পরিবেশগতভাবে গৃহীত এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল চিংড়ি খামার উৎসাহিত করতে হবে। এই বিষয়ে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলো চালু করতে হবে
- উপকূলীয় অঞ্চলে জলজচাষের সকল সুযোগ এবং সম্ভাব্যতাগুলো ব্যবহার করতে হবে। কাঁকড়া চাষ, মুক্তা চাষ, সমুদ্র শৈবাল চাষকে উৎসাহিত করতে হবে

কৃষি (নীতি ৪.৪.৫)

- পুরুষ ও মহিলা উভয় কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কৃষি ও শস্য বহুমুখীকরণ এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা সমর্থিত হবে
- উপকূলীয় এলাকার জন্য প্রযোজ্য বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মাটির পুষ্টি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য

গবাদিপশু (নীতি ৪.৪.৬)

- গবাদিপশুর জন্য গোচারণ ভূমির ব্যবস্থা করা হবে। গবাদিপশু উন্নয়নের জন্য সুবিধাসমূহ বৃদ্ধি করা হবে
- স্থানীয় প্রজাতিসহ বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস-মুরগী পালনের জন্য সুবিধাসমূহ উন্নত করা হবে

বনায়ন (নীতি ৪.৪.৭)

- নতুন জেগে উঠা চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের ব্যবস্থা নেওয়া হবে
- বন সংরক্ষণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে
- সামাজিক বনায়নকে উৎসহিত এবং সম্প্রসারণ করা হবে

শক্তি (নীতি ৪.৪.৮)

- গুরুত্বপূর্ণ শক্তির উৎস্য হিসাবে উপকূলীয় এলাকার জোয়ার-ভাটা এবং ঢেউয়ের শক্তির সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা হবে
- সকল প্রকার শক্তির (যেমন তেল, গ্যাস, কয়লা, পারমাণবিক খনিজ পদার্থ, জলবিদ্যুৎ, বায়োমাস জ্বালানী, সৌর, বায়ু এবং জোয়ারের ঢেউ) নিয়মিত/ধারাবহিক মূল্যায়ন গ্রহণ করা হবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। প্রকৃতিকে নষ্ট না করে সমুদ্রবর্তী এলাকায় পেট্রোলিয়াম সম্পদের অনুসন্ধান এবং মূল্যায়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে

মডিউল ৫

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইন ও নীতিসমূহ

মডিউল ৫
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইন ও নীতিসমূহ

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণঃ

- জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সময় ঃ ১ ঘন্টা।

পদ্ধতি ঃ মুক্ত আলোচনা, প্রশ্ন ও উত্তর, দলীয় কাজ, পঠন ও আলোচনা এবং দৃশ্যমান উপস্থাপনা।

উপকরণ ঃ হ্যান্ড আউট, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার, ভিপ কার্ড, ভিপবোর্ড, পোস্টার এবং মাল্টিমিডিয়া।

প্রক্রিয়া ঃ

ধাপ-০১ # অধিবেশনে স্বাগত ও শুভেচ্ছা

- অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কুশল বিনিময় করুন।
- পূর্বের অধিবেশনের সূত্র ধরে আলোচনা শুরু করুন।
- বলুন, এখন আমরা জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইন ও নীতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করবো।

ধাপ-০২ # জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ

- আলোচনার শুরুতেই বলুন, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইন ও নীতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা জেনে নেই জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কি বোঝায়? তাঁদের উত্তরগুলো শোনার পর জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে আলোচনা করুন।
- এবার অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান, দুর্যোগ কি? তাঁদের উত্তরগুলো শোনার পর অংশগ্রহণকারীদের ত্রয়ীদলে (প্রতি দলে ৩ জন) ভাগ করুন এবং প্রতি ত্রয়ীদলকে ২টি কার্ড ও ১টি মার্কার কলম দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহের উপর ২টি পয়েন্টস ২টি কার্ডে লিখতে বলুন। লেখার জন্য ৭মিনিট সময় দিন।
- নির্দিষ্ট সময়ের পর কাডর্গুলো সংগ্রহ করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করে তা ভিপবোর্ডে গুচ্ছ করুন।
- গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য বাদ পড়লে তা হ্যান্ড আউটের সহায়তা নিয়ে আলোচনা করুন।

ধাপ-০৩ # বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯

- এপর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের বলুন, জলবায়ু ও দুর্যোগ সম্পর্কে আমরা জেনেছি, এবার বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ সম্পর্কে আলোচনা করবো। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ বলতে কি বুঝি? তাঁদের উত্তরগুলো নেয়ার পর প্রয়োজনে হ্যান্ড আউটের সহায়তা নিয়ে তৈরিকৃত পোস্টার বা মাল্টিমিডিয়ায় বিষয়সমূহ দেখিয়ে আলোচনা করুন।

ধাপ-০৪ # বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২

- এবার অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন করে জেনে নিন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ বলতে কি বোঝায়?
- উত্তরগুলো শুনে নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ কি? তাঁদের উত্তরগুলো শুনুন এবং প্রয়োজনে ফ্লিপশীটে লিখুন এবং আলোচনা করুন।
- গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য বাদ পড়লে তা হ্যান্ড আউটের সহায়তা নিয়ে আলোচনা করে ধারণা পরিষ্কার করুন।
- সবশেষে ছোট ছোট প্রশ্ন করে অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।
- ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

হ্যান্ড আউট-৫

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইন ও নীতিসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তন

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্নক ঝুঁকির মধ্যে যে দেশগুলো রয়েছে বাংলাদেশের স্থান তাদের শীর্ষে। এটা বৈজ্ঞানিক এবং কমিউনিটির আলোচনা থেকে স্বীকৃত যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত দেশ।

জলবায়ু পরিবর্তন

কোন অঞ্চলের গড় আবহাওয়া, ঋতুর স্বাভাবিক সময় বা আবহাওয়ার চরম ঘটনাবলির পরিবর্তনই হলো জলবায়ু পরিবর্তন। বিজ্ঞানীদের মতে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক চক্র আছে। প্রতি ১১ বছরে, ১৫০০ বছরে, ৯ হাজার বছরে, ২৬ হাজার বছরের চক্রে জলবায়ুর স্বাভাবিক পরিবর্তন হয় (Astrnomical theory of Climate Change, 2010)।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ঃ

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান প্রধান নেতিবাচক প্রভাবগুলো হলো-

- তাপমাত্রার পরিবর্তন
- বৃষ্টিপাতের তারতম্য
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি
- গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি
- বন্যা বৃদ্ধি
- খরা বৃদ্ধি

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯/Bangladeh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), 2009

২০০৮ সালে বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনের ক্ষেত্রে প্রধান নীতিমালা হিসেবে ১০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২০০৯ সালে এটি সংশোধন করা হয়। এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিক্রিয়া সমূহ মোকাবেলায় দেশের সক্ষমতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি করবে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক সফলতা আনয়ন এবং দুযোর্গেও ঝুঁকি কমিয়ে আনাই ছিল এ উদ্দেশ্য। ১০ বছর মেয়াদি এ পরিকল্পনায় ছয়টি উদ্দেশ্যের উপর ৪৪ টা কর্মসূচি ও ১৪৫ টি কার্যক্রম রয়েছে। ছয়টি থিমের অধীনে ৩৪ টা তালিকাভুক্ত কর্মসূচি সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে অভিযোজনভিত্তিক। অন্যদিকে প্রশমনের আওতায় ১০ টি কর্মসূচি রয়েছে।

উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

- খাদ্য, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা
- সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- অবকাঠামোর উন্নয়ন
- গবেষণা ব্যবস্থাপনা
- প্রশমন ও স্বল্প কার্বন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ
- ব্যক্তিগত দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০-এ নিম্নরূপ তিন স্তর বিশিষ্ট বিসিসিটিএফ'র পরিচালনা কাঠামো প্রণীত হয়েছে-

- বোর্ড অব ট্রাস্টি
- টেকনিক্যাল কমিটি
- সাব-টেকনিক্যাল কমিটি

ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০এর ধারা ৯ (১)এ বলা হয়েছে ট্রাস্টি বোর্ড পার্শ্বেবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা: -

এছাড়াও থাকবেন সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লি প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন; সরকার কর্তৃক মনোনীত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দুইজন বিশেষজ্ঞ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী এই বোর্ড এর চেয়ারম্যানও হবেন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, সচিব এই বোর্ড এর সদস্য সচিবও হবেন।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; অর্থ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; কৃষি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; মন্ত্রিপরিষদ সচিব; গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক; সচিব, অর্থ বিভাগ; সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

- ***ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যাবলি***

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০-এর ধারা ১০-এ বলা হয়েছে ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ

(ক) ট্রাস্টের কার্যক্রম সার্বিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 বাস্তবায়নের জন্য ট্রাস্টের তহবিলের সর্বোচ্চ শতকরা ৬৬ ভাগ অর্থ ব্যবহারের নিমিত্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি অনুমোদন এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মোট তহবিলের সর্বোচ্চ শতকরা ৬৬ ভাগ অর্থ এবং জমাকৃত শতকরা ৩৪ ভাগ অর্থ হইতে সুদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচির অনুকূলে ছাড়করণ;

(গ) তহবিলের জমাকৃত অবশিষ্ট শতকরা ৩৪ ভাগ অর্থ বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) ট্রাস্টের তহবিলের অর্থে গৃহীতব্য প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নীতিনির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা ও প্রকল্প বা কর্মসূচির চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান;

(ঙ) দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থায়ন এবং বাজেট পরিকল্পনা সম্পর্কে কারিগরি কমিটিকে দিক নির্দেশনা প্রদান;

(চ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিকারের ব্যবহারিক গবেষণা (action research) পরিচালনায় কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুমোদন;

(ছ) সরকারের অর্থায়ন ব্যতীত অন্যান্য উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন দাতা দেশ বা সংস্থার সাথে যোগাযোগ, অর্থায়ন প্রাপ্তির উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ;

(জ) সামগ্রিক মূল্যায়ন টিম গঠন (Evaluation team) এবং প্রতি বৎসর ন্যূনতম একবার মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিমার্জন ও অনুমোদন;

(ঝ) কারিগরি কমিটির সুপারিশক্রমে গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচির সমস্যা নিরসন এবং এ লক্ষ্যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপ-এর আয়োজনের প্রস্তাব অনুমোদন;

(ঞ) প্রকল্প বা কর্মসূচিসমূহ কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান;

(ট) গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানকল্পে নীতিমালা প্রণয়ন;

(ঠ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(ড) এই ধারার অধীনে কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য করা;

(ঢ) কোন আর্থিক বৎসরে যথাযথ প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ সম্ভব না হইলে অব্যবহৃত অর্থ তহবিলে স্থানান্তরকরণ;

(ণ) ট্রাস্টি বোর্ডের প্রয়োজনে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ;

(ত) সময়ে সময়ে সরকার প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে তাহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

দুর্যোগ (Disaster) এর সংজ্ঞা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এর ধারা ২(১১) এ বলা হয়েছে "দুর্যোগ (Disaster)" অর্থ প্রকৃতি বা মনুষ্যসৃষ্ট অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট নিম্নবর্ণিত যে কোন ঘটনা, যাহার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা আক্রান্ত এলাকার গবাদি পশু, পাখি ও মৎস্যসহ জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকা, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, সম্পদ, সম্পত্তি ও পরিবেশের এইরূপ ক্ষতিসাধন করে অথবা এইরূপ মাত্রায় ভোগান্তির সৃষ্টি করে, যাহা মোকাবেলায় ঐ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ, সামর্থ্য ও সক্ষমতা যথেষ্ট নয় এবং যাহা মোকাবেলার জন্য ত্রাণ এবং বাহিরের যে কোন প্রকারের সহায়তা প্রয়োজন হয়, যথা:-

(অ) ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী, টর্নেডো, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, অস্বাভাবিক জোয়ার, ভূমিকম্প, সুনামি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, নদীভাঙ্গন, উপকূল ভাঙ্গন, খরা, মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা, মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক দূষণ, ভবনধস, ভূমিধস, পাহাড়ধস, পাহাড়ী ঢল, শিলাবৃষ্টি, তাপদাহ, শৈত্যপ্রবাহ, দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা, ইত্যাদি;

(আ) বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড, জলযান ডুবি, বড় ধরনের ট্রেন ও সড়ক দূর্ঘটনা, রাসায়নিক ও পারমাণবিক তেজক্রিয়তা, জ্বালানি তেল বা গ্যাস নিঃসরণ অথবা গণবিধ্বংসী কোন ঘটনা;

(ই) মহামারী সৃষ্টিকারী ব্যাধি, যেমন প্যান্ডেমিক ইনফ্লুয়েঞ্জা, বার্ডফ্লু, এনথ্রাক্স, ডায়রিয়া, কলেরা, ইত্যাদি;

(ঈ) ক্ষতিকর অণুজীব, বিষাক্ত পদার্থ এবং প্রাণসক্রিয় বস্তুর সংক্রমণসহ জৈব উদ্ভূত বা জৈবিক সংক্রামক দ্বারা সংক্রমণ;

(উ) অত্যাবশ্যকীয় সেবা বা দুর্যোগ প্রতিরোধ অবকাঠামোর অকার্যকারিতা বা ক্ষতিসাধন; এবং

(ঊ) ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি সৃষ্টিকারী কোন অস্বাভাবিক ঘটনা এবং দৈব দুর্বিপাক।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২

এদেশে দুর্যোগ মোকাবেলা বিষয়ক কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা এবং সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাঠামো গড়ে তুলতে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২, প্রণয়ন করা হয়। যেহেতু দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব সহনীয় পর্যায়ে এনে সার্বিক দুর্যোগ লাঘব করা, দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা, দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদান করা এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করাসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাঠামো গড়ে তোলার জন্য বিধান করা প্রয়োজন বিবেচনায় এ আইন প্রণীত হয়। এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো-

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তিবর্গকে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল থাকিবে ।

কাউন্সিলের সভাপতি হবেন প্রধানমন্ত্রী। সদস্য-সচিব হবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব। সদস্য থাকবেন স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী; কৃষি মন্ত্রী; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী; যোগাযোগ মন্ত্রী; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী; খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী; পানিসম্পদ মন্ত্রী; নৌ পরিবহন মন্ত্রী; গহায়ন ও গণপর্ত মন্ত্রী।

এছাড়াও থাকবেন সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীর প্রধান। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব সদস্য হিসেবে থাকবেন। যেমন- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব; অর্থ বিভাগের সচিব; কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব; স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সচিব; খাদ্য বিভাগের সচিব; ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব-ইত্যাদি। এছাড়াও থাকবেন বর্ডার গার্ড, র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডএর মহাপরিচালক এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি।

কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

ধারা ৬

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতিমালা ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- বিদ্যমান দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম পদ্ধতি পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নপূর্বক উহার সংশোধন, পরিমার্জন বা পরিবর্তনের জন্য কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কমিটি ও ব্যক্তিবর্গকে কৌশলগত পরামর্শ প্রদান;
- দুর্যোগ পরবর্তী সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম এবং উহার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কমিটি ও ব্যক্তিবর্গকে কৌশলগত নির্দেশনা প্রদান;
- দুর্যোগ মোকাবেলা বা পুনর্বাসন বিষয়ে গৃহীত সরকারি প্রকল্প বা কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- দুর্যোগ সংক্রান্ত সকল বিষয়, কার্যাদি, নির্দেশনা, কর্মসূচি, আইন, বিধি, নীতিমালা, ইত্যাদি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা, ইত্যাদি আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা পরামর্শ প্রদান।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

ধারা ৯

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হবে নিম্নরূপ, যথা: -

- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব সহনীয় পর্যায়ে আনিয়া সার্বিক দুর্যোগ লাঘব করা;
- দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমগুলিকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা সুপারিশ, ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা;
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
- সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা ।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

ধারা ১২(১)

দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের উপর গবেষণা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ আনুষাঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার, প্রয়োজনে, একটি 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠন

ধারা ১৩(১)

দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর জরুরি সাড়া প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার জনগোষ্ঠীভিত্তিক একটি কর্মসূচি প্রণয়ন ও উহার অধীন জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠন করিতে পারিবে।

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ

ব্যাপক আকারের দুর্যোগের সময় সাড়াদান কার্যক্রম সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ গঠিত হইবে যথা:-

ধারা ১৪(১)

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী; স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী; সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার; সচিব- অর্থ বিভাগের, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের, তথ্য মন্ত্রণালয়ের, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এই সমন্বয় গ্রুপের সভাপতি হবেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সচিব সদস্য-সচিব হইবেন।

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

ধারা ১৬

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রপের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

- দুর্যোগ অবস্থা মূল্যায়ন এবং দুর্যোগ সাড়াদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সচল করা;
- দুর্যোগে সাড়াদানের জন্য সম্পদ প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- সতর্ক সংকেতসমূহের যথাযথ প্রচার নিশ্চিত করা;
- সাড়াদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয় করা;
- দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম তদারকি করা;
- দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা;
- টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকায় দ্রুত অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- ত্রাণ সামগ্রী, তহবিল ও যানবাহন বিষয়ক অগ্রাধিকার নিরূপণ ও নির্দেশনা প্রদান করা;
- দুর্যোগকালীন এলাকায় অতিরিক্ত জনবল ও সম্পদ প্রেরণ করা এবং যোগাযোগ ও সুবিধাদি প্রদানের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসহ সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণের বিষয় সমন্বয় করা;
- দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থায় তথ্য প্রবাহ সচল রাখা;
- কাউন্সিল এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা এবং কাউন্সিলকে দুর্যোগ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা;
- বহু সংগঠনভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Multi-agency Disaster incident Management System) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করা;
- দুর্যোগের প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাস পদক্ষেপের বিষয়ে সুপারিশ করা;
- সম্পদ, সেবা, জরুরি আশ্রয়স্থল হিসাবে চিহ্নিত ভবন, যানবাহন বা অন্যান্য সুবিধাদি হুকুমদখল বা রিক্যুইজিশন এর বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা;
- মারাত্মক ধরনের দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় বা মারাত্মক ধরনের দুর্যোগ ঘটিতে পারে এইরূপ অবস্থার অবনতির প্রেক্ষিতে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;
- দুর্যোগকালীন বা দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা সম্পদের যোগান, সরবরাহ বা ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট হইতে একসঙ্গে এক বা একাধিক বৎসরের জন্য দুর্যোগ-পূর্ব সময়ে আগাম ক্রয়ের বিষয়ে সম্মতি গ্রহণের নিমিত্ত সুপারিশ করা।

জাতীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ধারা ১৭

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত কমিটি, বোর্ড ও প্লাটফরম থাকিবে, যথা:-
(ক) আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি;
(খ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি;
(গ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটি;
(ঘ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড;
(ঙ) ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতাবৃদ্ধি কমিটি;
(চ) ন্যাশনাল প্লাটফর্ম ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন;
(ছ) দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার, কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি;

স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও গ্রুপ

ধারা (১৮)(১)

স্থানীয় পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:
(ক) সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;
(খ) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;
(গ) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;
(ঘ) পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;
(ঙ) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি; এবং
(চ) প্রয়োজনে, দুর্যোগকালীন জেলা বা উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি।

ধারা (১৮)(২)

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে স্থানীয় পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ গঠিত হইবে, যথা:-
(ক) সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ;
(খ) জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ;
(গ) উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ;
(ঘ) পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ।

দূর্গত এলাকা ঘোষণা ও করণীয়

দূর্গত এলাকা ঘোষণা

ধারা ২২(১)

রাষ্ট্রপতি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, দেশের কোন অঞ্চলে দুর্যোগের কোন ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা মোকাবেলায় অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং অধিকতর ক্ষয়ক্ষতি ও বিপর্যয় রোধে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা জরুরি ও আবশ্যক, তাহা হইলে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে দূর্গত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবেন।

ধারা ২২(২)

কোন অঞ্চলে সংঘটিত মারাত্মক ধরণের কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত দুর্যোগের অধিকতর ক্ষয়ক্ষতি ও বিপর্যয় রোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি ও আবশ্যক হইলে স্থানীয় পর্যায়ের কোন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, গ্রুপ বা সংস্থা অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে দূর্গত এলাকা ঘোষণার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিতে পারিবে।

ধারা ২২ (৩)

উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন সুপারিশ প্রাপ্ত হইলে জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে বিষয়টির যথার্থতা যাচাইপূর্বক উহার মতামতসহ সংশ্লিষ্ট সুপারিশ সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সুপারিশ গ্রহণ করত বিবেচ্য অঞ্চলকে দূর্গত এলাকা ঘোষণার জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার অধীন দূর্গত এলাকা ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইলে উহার মেয়াদ অনধিক ২ (দুই) মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে যদি না উক্ত মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বেই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উহা হ্রাস, বৃদ্ধি বা প্রত্যাহার করা হয়।

দূর্গত এলাকা সংক্রান্ত বিশেষ করণীয় কার্যাবলি

ধারা ২৩(১)

কোন অঞ্চলকে দূর্গত এলাকা ঘোষণা করা হইলে সরকার, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থা এবং এই আইনের অধীন গঠিত কমিটিসমূহকে জরুরি ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত বিশেষ করণীয় কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:-

- দুর্যোগ অবস্থা মোকাবেলায় দূর্গত এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি মজুদে থাকা সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;
- প্রয়োজনে অতিরিক্ত সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;
- জননিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ;
- জান-মাল ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
- স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ।

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সহায়তা

ধারা ২৭(১)

সরকার, বিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে, দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত পুনর্বাসনের জন্য বা ঝুঁকি হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমে অতিদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষত বয়োবৃদ্ধ, মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা ও ঝুঁকিহ্রাসকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

ধারা ২৭(১)

দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরি সাড়া প্রদান বা মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী বা ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপদাপন্ন হইলে, তাহাদের উপযুক্ত পুনর্বাসন বা ঝুকিঁ হ্রাসের জন্য সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।
[ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী অর্থে আর্থ-সামাজিক ও নানাবিধ সুবিধা হইতে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী, উপ-জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃ-গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত হইবে]

দুর্যোগ পরিস্থিতির তথ্য সম্পর্কে করণীয়

ধারা ২৮

জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ের কোন কমিটির সভাপতি বা কোন সদস্য যদি স্বয়ং বা কোন ব্যক্তি বা সংগঠন কর্তৃক অবহিত হইয়া এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন এলাকায় দুর্যোগ পরিস্থিতি আসন্ন, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে অবহিত করিবেন।

অনিয়ম, গাফিলতি বা অব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অভিযোগ, আপিল

ধারা ২৯

দুর্যোগ আক্রান্ত কোন ব্যক্তি, পরিবার বা জনগোষ্ঠীর নিকট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোন অনিয়ম, গাফিলাতি বা অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হইলে তিনি বা তাহারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ের কোন কমিটির নিকট অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিবেন এবং উক্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনে তদন্তপূর্বক, সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবে।

কোন কমিটির কোন সিদ্ধান্ত দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি, জাতীয় পর্যায়ের কোন কমিটির সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, সরকারের নিকট এবং স্থানীয় পর্যায়ের কমিটির সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে সরকার বা, ক্ষেত্রেমত, বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

জরুরি সাড়া প্রদান কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ

ধারা ৩০

জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ এর নিকট হইতে কোন সুপারিশপ্রাপ্ত হইলে জেলা প্রশাসক তদ্ভিত্তিতে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা চাহিয়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিকট চাহিদাপত্র প্রেরণ করিতে পারিবে।

গণমাধ্যম ও সম্প্রচার কেন্দ্রের প্রতি নির্দেশনা

ধারা ৩৪

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, যে কোন রেডিও বা বেতার, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল, মুদ্রণ মাধ্যম, টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বা ইলেকট্রনিক বা কেবল নেটওয়ার্ক অথবা এইরূপ তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর সম্প্রচার মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে আসন্ন দুর্যোগাবস্থা, দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট আগাম সতর্ক সংকেত বা দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ক বা জনসচেতনতামূলক তথ্য, চিত্র বা সংবাদ ইত্যাদি প্রচার, প্রকাশ ও প্রদর্শনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি উক্তরূপ নির্দেশনা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে। কোন ব্যক্তি যদি ধারা ৩৪ এর অধীন প্রদত্ত আদেশ অমান্য করেন বা অমান্য করিতে সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ফরম-১

প্রশিক্ষণ পূর্ব শিক্ষণ যাচাই পত্র (নমুনা)

প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঃ .... তারিখ ঃ ....

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ .... পদবী ঃ ....

কর্ম এলাকার নাম ঃ .... সময় ঃ ১০ মিনিট

(সঠিক উত্তরের ঘরে √ চিহ্ন দিন)

ক্রমিক	প্রশ্ন	প্রশিক্ষণ পূর্ব	
		হ্যাঁ	না
প্রশ্ন ১	রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কিছু নিয়মের সমষ্টিকেই কি আইন বলে?		
প্রশ্ন ২	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কি আইনের প্রয়োজন আছে?		
প্রশ্ন ৩	আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সহ-ব্যবস্থাপনার ভূমিকা নাই, এ বিষয়ে আপনি কি একমত?		
প্রশ্ন ৪	বন আইন ও বন্যপ্রাণী আইন প্রয়োগে কি কোন সুবিধা আছে?		
প্রশ্ন ৫	মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণে আইনের প্রয়োজন আছে কি?		
প্রশ্ন ৬	শুধু আইন প্রয়োগে অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ বন্ধ হবে কি?		
প্রশ্ন ৭	জলাধার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আইনের দরকার নাই, এ বিষয়ে আপনি কি একমত?		
প্রশ্ন ৮	পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে পরিবেশ আইনের কি কোন দরকার আছে?		
প্রশ্ন ৯	আইন প্রয়োগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পর্কে কি জনসচেতনতা বৃদ্ধি পায়?		
প্রশ্ন ১০	প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় আইন বাস্তবায়নে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যরা কি সরকারকে সহায়তা করতে পারে?		

ফরম-২

প্রশিক্ষণ পরবর্তী শিক্ষণ যাচাই পত্র (নমুনা)

প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঃ .... তারিখ ঃ ....

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ .... পদবী ঃ ....

কর্ম এলাকার নাম ঃ .... সময় ঃ ১০ মিনিট

(সঠিক উত্তরের ঘরে √ চিহ্ন দিন)

ক্রমিক	প্রশ্ন	প্রশিক্ষণ পরবর্তী	
		হ্যাঁ	না
প্রশ্ন ১	রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কিছু নিয়মের সমষ্টিকেই কি আইন বলে?		
প্রশ্ন ২	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কি আইনের প্রয়োজন আছে?		
প্রশ্ন ৩	আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সহ-ব্যবস্থাপনার ভূমিকা নাই, এ বিষয়ে আপনি কি একমত?		
প্রশ্ন ৪	বন আইন ও বন্যপ্রাণী আইন প্রয়োগে কি কোন সুবিধা আছে?		
প্রশ্ন ৫	মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণে আইনের প্রয়োজন আছে কি?		
প্রশ্ন ৬	শুধু আইন প্রয়োগে অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ বন্ধ হবে কি?		
প্রশ্ন ৭	জলাধার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আইনের দরকার নাই, এ বিষয়ে আপনি কি একমত?		
প্রশ্ন ৮	পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে পরিবেশ আইনের কি কোন দরকার আছে?		
প্রশ্ন ৯	আইন প্রয়োগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পর্কে কি জনসচেতনতা বৃদ্ধি পায়?		
প্রশ্ন ১০	প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় আইন বাস্তবায়নে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যরা কি সরকারকে সহায়তা করতে পারে?		

ফরম-৩

প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন (নমুনা)

প্রশিক্ষণের নাম ঃ ....

প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঃ .... তারিখ ঃ ....

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ .... পদবী ঃ ....

কর্ম এলাকার নাম ঃ .... সময় ঃ ১০ মিনিট

(সঠিক উত্তরের ঘরে √ চিহ্ন দিন)

ক্রমিক	বিষয়	ভালভাবে	মোটামুটি	মোটেই না
১	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য অর্জন হয়েছে			
২	প্রশিক্ষণের সহায়তা প্রদান সহজ ছিল			
৩	প্রশিক্ষণের সার্বিক ব্যবস্থাপনা			
৪	প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়গুলো সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে			
৫	প্রশিক্ষণের উপকরণগুলো ঠিকমত পাওয়া গিয়েছে			
৬	প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়গুলো সময় উপযোগী ছিল			
৭	কর্মক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারবেন			
৮	প্রশিক্ষণ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল	১. ২. ৩.		
৯	প্রশিক্ষণের যেসব আলোচ্য বিষয়গুলো আগে থেকে জানা ছিল	১. ২. ৩.		
১০	মন্তব্য			